চিত্র ৫



সুকুমারী দত্ত (গোলাপসুন্দরী)

জন্ম : ? মৃত্যু : ?

বাংলার নট-নটী

প্রথম খণ্ড

দেবনারায়ণ গুপ্ত

সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট । ক ল কা তা ৬

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৫৯

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক 'সাহিত্যলোক' ৩২।৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে
প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক 'বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স' ৫৭-এ কারবালা
ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত

খ্যাতকীর্তি নাট্যকার ও কথাশিল্পী
ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
সুহৃদ্বরেষু

পূর্বাভাষ

ইংরেজ আমলে ১৭৯৫ সালে সর্বপ্রথম কলিকাতা শহরে প্রোসিনিয়াম মঞ্চে বাংলা নাটক অভিনীত হয়। এই মঞ্চাভিনয় বাংলার নাট্য-প্রিয় মানুষদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এরপর কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের গৃহে মধ্যে মধ্যে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে নাট্যাভিনয় সুরু হয়। ১৭৯৫ সালে যার প্রকাশ, তার বিকাশ সাধনে ১৮৭২ সালে কলিকাতায় পাবলিক থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বহু নাট্যকর্মীর অক্লান্ত চেষ্টায় ও একাগ্র সাধনায় বর্তমানে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় পৃথিবীর নাট্যশালার ইতিহাসে স্থান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা এবং অভিনয়শিল্পীরা, এমন কি কলাকুশলীরাও আমাদের রক্ষণশীল সমাজের কাছে সেদিন শুধু নিন্দার্হ-ই হননি, একপ্রকার অপাঙ্‌ক্তেয় হয়েই ছিলেন।

সেদিন মুষ্টিমেয় দর্শকদের ওপর নির্ভর করে, সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল। বহু শ্রম ও সাধনার ফলে, সেই রঙ্গালয় আজ যেমন জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে, তেমনি নট-নটীরা এবং নাট্যকর্মীরাও সমাজের কাছে সম্মান আদায় করতে পেরেছেন, আবার তাঁরা অগণিত দর্শকও সৃষ্টি করেছেন।

নাট্যশালার প্রথম যুগের নট ও নাট্যকারদের মধ্যে নটগুরু গিরিশচন্দ্র, নটকুল চূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর, রসরাজ অমৃতলাল এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ঘটনাবহুল পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত রচিত হয়েছে। নটী বিনোদিনী তাঁর আত্মকথা লিখে রেখে গেছেন। এ ছাড়া সেকালের কয়েকজন কৃতি নট-নটী সম্পর্কে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে মাত্র। অথচ গিরিশযুগে এমন অনেক সার্থকনামা নট-নটীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের ঘটনা-

বহুল জীবনের এমন অনেক তথ্য আছে, যা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত।

পাশ্চাত্য দেশে অভিনয়-শিল্পীদের জীবনী গ্রন্থ রচনার প্রবণতা দেখা যায়। এই সব গ্রন্থ ও-দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে।

আমাদের দেশের নট-নটীদের নিয়ে এই রকম জীবনী রচনার কল্পনা, আমি বহুদিন ধরেই পোষণ করে আসছিলাম। 'নবকল্লোল' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের আগ্রহে বিগত দুই বৎসরের অধিককাল প্রতি মাসে গিরিশযুগের এক একজন খ্যাতকীর্তি অভিনয়-শিল্পীর জীবন-কাহিনী রচনা করতে সুরু করি। সাহিত্যিক ও নাট্যানুরাগী বন্ধুরা রচনাগুলি পাঠে আমাকে উৎসাহিত করেন। 'নবকল্লোল'-এ এখনও প্রতি মাসে এক একজন কৃতী শিল্পীর জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে। 'নব-কল্লোল'-এ প্রকাশিত কিছু জীবন-কাহিনী নিয়ে 'বাংলার নট-নটী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হোল। দ্বিতীয় খণ্ডে গিরিশযুগের আরো কয়েকজন অভিনয়-শিল্পীর পরিচয় প্রদান করে, শিশিরযুগের শিল্পীদের জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করার ইচ্ছা আছে। শিশিরযুগের প্রায় অধিকাংশ শিল্পীর সঙ্গে আমার জীবনের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তিন খণ্ডে বাংলার নট-নটীদের জীবনের পরিচয় প্রদান করার বাসনা নিয়ে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হোল। জীবন-সায়াহ্নে আমি আমার জীর্ণ দেহ নিয়ে, এই বৃহৎ কর্ম সমাপ্ত করে যেতে পারবো কিনা জানি না।

নাট্যশালার গোড়ার যুগের অধিকাংশ স্বনামধন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে অভিনেত্রীদের জন্ম-মৃত্যুর সাল-তারিখ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। বহু পরিশ্রম করে অনেকের সাল-তারিখ সংগ্রহ করতে হয়েছে। কোন্ অভিনেতা-অভিনেত্রী কত বছর বয়সে মঞ্চে যোগদান করেছেন, তাঁদের সেই বয়স এবং মৃত্যুকালীন বয়স ধরে জন্ম সাল বার করতে হয়েছে। বঙ্গ রঙ্গভূমিতে প্রথম যে চারজন অভিনেত্রী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেছিলেন তাঁদের অন্যতমা খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী গোলাপ-সুন্দরীর (সুকুমারী দত্ত) জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সংগ্রহ করা সম্ভব হোল

না। সে যুগের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, গঙ্গামণি বা গঙ্গাবাঈজীর সম্পর্কেও আলোচনা করা সম্ভব হোল না। ক্ষেত্রমণি সম্পর্কে 'ভারতকোষ' গ্রন্থে সামান্য কয়েক ছত্রে তাঁর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে মাত্র। সে যুগের প্রসিদ্ধা গায়িকা-অভিনেত্রী গঙ্গামণির মৃত্যুর পর রসরাজ অমৃতলাল তাঁর সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। সেই কবিতায় রসরাজ সখেদে লিখেছিলেন—'গঙ্গা নাই, গঙ্গা নাই, গঙ্গা নাই আর—' এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে তিনি তাঁর কণ্ঠসুধা দিয়ে অগণিত দর্শককে আনন্দদান করে গেছেন। অথচ নাট্যশালার ইতিহাসে এঁদের সম্পর্কে এমন কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করা নেই, যার দ্বারা তাঁদের কর্ম্মজীবনের প্রতি আলোকপাত করা যায়।

নাট্যশালার গোড়ার যুগে অভিনয়-শিল্পীদের ছবি তোলার রেওয়াজ না থাকায়, অনেকের ছবিও দুষ্প্রাপ্য। এমন কি সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, যিনি বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল নামে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁর স্বাভাবিক কোন প্রতিকৃতি পাওয়া যায় না। আত্মহননের পর মেয়ো হাসপাতালে তাঁর মৃতদেহের যে ছবি তোলা হয়েছিল, সেইটিই তাঁর একমাত্র প্রতিকৃতি। অথচ সুদর্শন অভিনেতারূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। আলোচ্য গ্রন্থে মৃত্যুর পরে তোলা তাঁর একমাত্র ছবিটিই মুদ্রিত করা হোল।

অমরেন্দ্রনাথ তাঁর ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর, এই ছবি সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। শিল্পীদের নাটকীয় চরিত্রের বেশভূষায় সজ্জিত করে এবং মঞ্চে অভিনয়কালীন **action still** বা অভিব্যক্তিসহ ফটো তুলে, তাঁর 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করেছেন এবং কোন কোন ছবি হ্যাণ্ডবিলে ছেপে প্রচার করেছেন।

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল ও অমরেন্দ্রনাথের বহু তথ্য সম্বলিত জীবনী পাঠের সুযোগ থাকায় আমি নাট্যলোকের এই চারজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনের বিশেষ কোন একটি দিকের প্রতি

আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। তাছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে এঁদের কথা বহু শিল্পীর জীবনের ঘটনা প্রসঙ্গেও এসেছে।

এই গ্রন্থ রচনায় প্রবীণতম নাট্যবিদ্ অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীহরীন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। অধিকাংশ দুষ্প্রাপ্য ছবি তাঁর সংগ্রহশালা থেকে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রদ্ধেয় হরীনদার ঋণ আমার কাছে অপরিশোধ্য। এ ছাড়া যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থের এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য আমায় নিতে হয়েছে, তাঁদের কাছেও আমার ঋণ স্বীকার করছি। উপসংহারে 'সাহিত্যলোক'-এর কর্ণধার শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষের কথা উল্লেখ না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'নবকল্লোল'-এর কয়েক সংখ্যায় রচনা-গুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তা হস্তগত করতে থাকেন এবং অদম্য উৎসাহের সঙ্গে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তাঁর উৎসাহ অনেক সময়ে আমার কাছে উৎপাত বলে মনে হলেও, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তিনি পুস্তকটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার চেষ্টা করেছেন।

বিনীত
দেবনারায়ণ গুপ্ত

সূচীপত্র

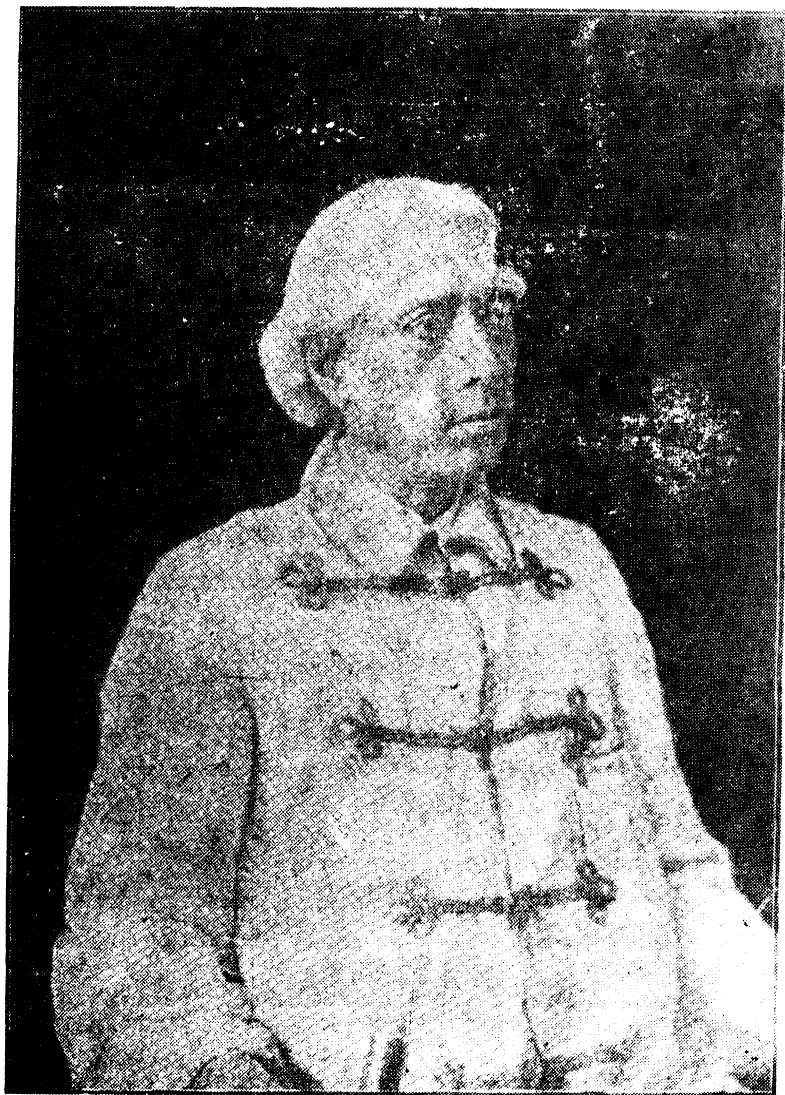
চিত্র ১



নটগুরু গিরিশচন্দ্র

জন্ম : বাং ১২৫০ ১৫ই ফাল্গুন। মৃত্যু : বাং ১৩১৮ ২৫শে মাঘ।

চিত্র ২



নটকুল চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর
জন্ম : ইং ১৮৫০। মৃত্যু ইং ১৯০৮ ১৬ই সেপ্টেম্বর।

চিত্র ৩



রসরাজ অমৃতলাল বসু

জন্ম : ইং ১৮৫২ । মৃত্যু : ইং ১৯২৯ ।

চিত্র ৪



নট-নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
জন্ম : ইং ১৮৪০। মৃত্যু : ইং ১৯০১ ২০শে এপ্রিল।

চিত্র ৬



বিনোদিনী দাসী

জন্ম : ইং ১৮৬৩। মৃত্যু : ইং ১৯৪১।

চিত্র ৭



বিদ্রোহী নায়ক উপেন দাস

জন্ম : বাং ১২৫৫। মৃত্যু : বাং ১৩০২ ২২শে শ্রাবণ।

চিত্র ৮



ট্র্যাজেডিয়ান মহেন্দ্রলাল বসু

জন্ম : বাং ১২৬০ ১২ই কার্ত্তিক। মৃত্যু : বাং ১৩০৭ ২৪শে ফাল্গুন।

চিত্র ৯



নট-নাট্যকার কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়

জন্ম : ইং ১৮৪৯ ২৯শে অক্টোবর। মৃত্যু : ইং ১৮৯৪ ১১ই মার্চ।

চিত্র ১৭



তিনকড়ি দাসী
জন্ম : বাং ১২৭৭। মৃত্যু : ইং ১৯২৬।

চিত্র ১১



রঙ্গমঞ্চের নেপোলিয়ান অমরেন্দ্রনাথ
জন্ম : ইং ১৮৭৬। মৃত্যু : ইং ১৯১৬।

চিত্র ১২



নট-সম্রাট দানিবাবু

জন্ম : ইং ১৮৬৮। মৃত্যু : ইং ১৯৩২ ২৮শে নভেম্বর।

চিত্র ১৩



নাট্য-সম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী

জন্ম : ইং ১৮৭৮। মৃত্যু : ইং ১৯৪৮ ২৯শে এপ্রিল।

চিত্র ১৪



নটী-কুলমণি কুসুমকুমারী

জন্ম : ইং ১৮৭৬। মৃত্যু : ইং ১৯৪৮ ২৯শে নভেম্বর।

চিত্র ১৫



সুধাকণ্ঠী সুশীলাবালা

জন্ম : ইং ১৮৮৪। মৃত্যু : ইং ১৯১৫ ৩রা জানুয়ারী।

চিত্র ১৬



নৃত্যকলাকুশলী নৃপেন্দ্রচন্দ্র

জন্ম : ইং ১৮৬৭। মৃত্যু : ইং ১৯২৭।

চিত্র ১৭



নট-নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী

জন্ম : ইং ১৮৭১। মৃত্যু : ইং ১৯২০ ৬ই নভেম্বর।

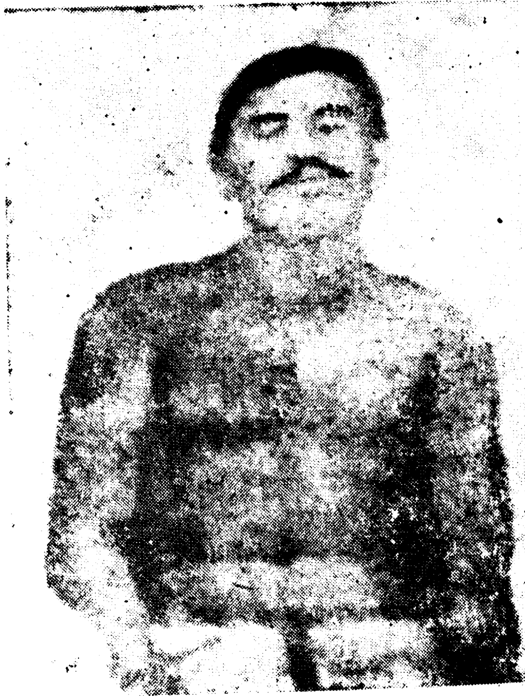
চিত্র ১৮



ট্রাজেডিয়ান অমৃতলাল মিত্র

জন্ম : ? । মৃত্যু : ১৯০৮ ২৭শে জুন ।

চিত্র ১৯



সুদক্ষ নট অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)

জন্ম : বাং ১২৬১। মৃত্যু : বাং ১২৯৭ ২রা চৈত্র।

চিত্র ২০



শ্রীমতী কিরণবালা

জন্ম : ইং ১৮৬৮। মৃত্যু : ইং ১৮৯০।

চিত্র ২১



সংগীত-সুনিপুণা অভিনেত্রী নরীসুন্দরী

জন্ম : ইং ১৮৭৭। মৃত্যু : ইং ১৯৩৯।

চিত্র ২২



স্ত্রী-চরিত্রাভিনেতা ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম : বাং ১২৬৩ । মৃত্যু : ? ।

চিত্র ২৩



শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্যা অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী
জন্ম : ইং ১৮৮৯।

চিত্র ২৪



নট-নায়ক অপরেশচন্দ্র

জন্ম : ইং ১৮৭৫ ১৯শে জুলাই। মৃত্যু : ইং ১৯৩৪ ১৫ই মে।

চিত্র ২৫



নট-নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : বাং ১২৫৭। মৃত্যু : বাং ১২৮৯।

নটগুরু গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গরঙ্গালয়ের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যাঁর প্রভা আজও বাংলা নাট্য-সাহিত্যে বিকিরণ করছে, যাঁর প্রভাব বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে আজও প্রভাবিত করে রেখেছে। নাট্য-রচনা, নাট্য-প্রযোজনা এবং নাট্যাভিনয়ের দ্বারা তিনি যে শ্রম ও সাধনা করে গেছেন, তা শুধু স্মরণযোগ্যই নয়, বিস্ময়করও বটে।

উনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল সমাজের নিন্দা ও গ্লানি উপেক্ষা করে, তিনি একাগ্রচিত্তে নাট্য-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। নটের কাজ সে যুগে নিন্দনীয় ছিল। এই নিন্দাকে উপলক্ষ্য করে তিনি লিখেছিলেন—

"লোকে কয় অভিনয়,
কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু—
অভিনেতাগণ—।"

এই নিন্দা ও গ্লানির জ্বালায় তাঁর অন্তর অহরহ পুড়েছে, বিরুদ্ধ সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে, কিন্তু দৃঢ়চেতা গিরিশচন্দ্র সে-সব উপেক্ষা করে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নটনাথের সেবা করে গেছেন।

সে যুগে 'নোটোগিরিশ' বলে যাঁরা তাঁকে অশ্রদ্ধা করেছেন, তাঁদের কানেই তিনি ভাল কথা শোনাতে চেয়েছেন। নাট্যশালার কলঙ্ক মোচন করতে চেয়েছেন। আশার আশায় তিনি সমগ্র জীবন যাপন করেছেন। লিখেছেন—

"রঙ্গভূমি ভালবাসি
হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি
জীবন-যাপন॥"

যে আশার নেশায় রঙ্গমঞ্চকে ভালবেসে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, উত্তরকালে তা যে সর্বাংশে সাফল্য লাভ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমানে নাটক ও নাট্যশালার প্রতি আমাদের এই যে অপরিসীম অনুরাগ এর কারণ, প্রতি মুহূর্তে জীবনের যেখানে অবক্ষয় ঘটে, নাটক তার পরিপূরক হিসাবে মনের ওপর কাজ করে, মনের জারকরসে দেহকে সঞ্জীবিত করে তোলে।

গিরিশচন্দ্র তাঁর এক প্রবন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে লিখেছেন,—"কালে অভিনয় কার্যের যে গরিমা প্রকাশ পাইবে এবং সর্বসাধারণে নটের আদর করিবে তাহা সত্য। কিন্তু সে আদরলাভের পথ পরিষ্কার বর্তমান নটমণ্ডলী আমাদিগকেই করিতে হইবে। অভিনয় কার্যের কেন কোনো কার্যেরই আদর প্রথমে হয় না। যদি আমরা রঙ্গালয় হইতে বুঝাইতে পারি যে সমস্ত কলাবিদ্যার উন্নতি রঙ্গালয় দ্বারা হইতেছে—কবি নাটক লিখিতেছেন, নট তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, গায়ক সুরসৃষ্টি করিতেছেন, চিত্রকর তুলি ধরিয়াছেন, ভাস্কর রঙ্গালয় সুসজ্জিত করিতেছেন, বৈজ্ঞানিকেরাও যোগদান করিয়া অবাস্তবে বাস্তবভ্রম উৎপাদন করিতেছেন, যদি আমরা দেখাইতে পারি যে, অভিনয়বিদ্যাও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় জাতীয় সভ্যতার পরিচয়স্থল, তবে নটসুধীজন সমাজে তাঁহার যোগ্য মর্যাদা, তাঁহার আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কার, তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার সিদ্ধি অবশ্যই লাভ করিবেন।"

গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে কবি, গীতিকার ও নট। পরবর্তী জীবনে নাট্যশালার প্রয়োজনে তাঁকে নাট্য-রচনায় মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন—"নাট্য-বাণীর বরপুত্র গিরিশচন্দ্র ইহার সেই মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। তাঁহার সময় হইতে লোকে বুঝিল, কেবল মাত্র অভিনয়-প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। নাট্য-বাণীর পূজার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ ইহার অন্ন নাটক। গিরিশচন্দ্র এ দেশের

নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার মজ্জায় মজ্জায় রস-সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র **Father of the Native Stage**। ইহার খুড়ো জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিল না। ইহা একপ্রকার অভিভাবকশূন্য বেওয়ারিশ অবস্থায় চলিতেছিল, পড়িতেছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল।...কাজেই বাঙ্গালা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা তিনিই।"

জীবনীলেখা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলতেন —"ওতে কেবল ওকালতী করা হয়। আমি চাই, **Paint me as I am**—আমি যা সেইভাবেই আমাকে চিত্রিত কর।" গিরিশচন্দ্র কি ছিলেন, কে ছিলেন, তারই কিছু কথা এখানে তুলে ধরা হোল।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র যিনি ছেলেবেলায় ঠাকুরমায়ের কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনে অভিভূত হয়ে যেতেন, 'অক্রুর-সংবাদ' শুনে শ্রীকৃষ্ণ ফিরে না আসার জন্যে চোখের জলে বুক ভাসাতেন, যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে উঠলেন—দুর্ধর্ষ, দুর্বার, দুর্বিনীত। তার ওপর আবার পয়লা নম্বরের নাস্তিক। অল্পবয়সে পিতৃ-মাতৃহারা হয়েছিলেন। মাথার ওপর বিধবা বড় বোন কৃষ্ণকিশোরী ছিলেন তাঁর অভিভাবিকা। কিন্তু তাঁর কতটুকু ক্ষমতা যে এই দুর্দান্ত ছোট ভাইটিকে স্ব-বশে রাখেন? বাড়ির মধ্যে যতটুকু পান, তার মধ্যে চরিত্র সংশোধনের জন্যে উপদেশ দেন, কখনো-বা বিরক্তি প্রকাশ করেন, গালাগালি করেন। কিন্তু বাড়ির বাইরে পা দিলেই—যে গিরিশ, আবার সেই গিরিশ। অথচ শৈশবে ঠাকুর দেবতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ছিল গিরিশের। মিথ্যে কথা বলতে জানতো না। নেশা-ভাঙ তো দূরের কথা—পানটি পর্যন্ত খেত না। কৃষ্ণকিশোরী ভাইয়ের চারিত্রিক সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেও হালে পানি পান নি। তাই ১৮৮৪ সালে গিরিশচন্দ্রের যখন ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হোল, তখন আত্মীয়-পরিজনেরা বড়ই স্বস্তি বোধ করেছিলেন। মনে করেছিলেন, সাধুসঙ্গ যখন

লাভ হয়েছে, তখন বোধহয় এবার গিরিশের জীবনের মোড় ঘুরে যাবে। চারিত্রিক সংশোধন হবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গিরিশের ওপর কোন বিধিনিষেধই আরোপ করেন নি। বরং কখনো কখনো মদ্যপান করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলে, অথবা মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুরের অন্যান্য ভক্তেরা বিরক্ত হলেও, ঠাকুর বিরক্ত হন নি। উপরন্তু, ঠাকুর ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে গিরিশকে 'ভৈরব'রূপে চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন—'ও আমার ভৈরব! ও সুরভক্ত! বীরভক্ত!'

এই সুরভক্ত, বীরভক্ত গিরিশকে নিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব লীলামাধুরী ভক্তদের কাছে দিন দিন প্রকট হতে লাগলো। কোনোদিন দেখা যায়—সুরাপানে মত্ত ভক্ত-ভৈরব-গিরিশচন্দ্রকে, কোনোদিন-বা তিনি সাদাচোখেই এসে বসেন, ভক্তজনদের মাঝে। ভজন-পূজনের বালাই নেই, আহার-বিহারের কোন বাছ-বিচার নেই, তবুও তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একান্ত আপনজন। যাঁর অশেষ কৃপায় তিনি চিহ্নিত হয়েছেন ভৈববরূপে, সেই কৃপাময়কেই তিনি আবার কখনো কখনো চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে গালাগাল দিয়ে বসেন। কখনো আবার সেই মানুষটিকেই দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে তর্কযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নররূপী নারায়ণরূপে প্রমাণ করতে। ভক্ত ভৈরব গিরিশের যুক্তিতর্কে শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথকেও হার মানতে হয়।

একদা যাঁর মন ছিল সংশয়াচ্ছন্ন, ঠাকুরের কৃপায় তিনি সংশয়মুক্ত হলেন। মনে এলো অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু বাহ্যিক আচার-আচরণে তাঁর কোন পরিবর্তন হোল না। তা না হোক,—তবুও ভগবান ভক্ত-দের কাছে বললেন—'ওর কাছে চেয়েছি আমি ষোল আনা, ও দেবে আমায় পাঁচসিকে পাঁচ আনা। দেখিস, ওর বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে পাওয়া যাবে না।'

অনেকে মনে করেন, গিরিশচন্দ্রের দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু তা নয়। পুরো তিন বছরও তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান নি। চল্লিশ বছর বয়সে গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ করেছিলেন। বাং ১২৯১ (ইং ১৮৮৪) সালের শেষের দিকে। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমাধিলাভ করেছেন বাং ১২৯৩ (ইং ১৮৮৬) সালের ৩১শে শ্রাবণ। অথচ এই অল্পদিনের মধ্যে পরমহংসদেবের অগণিত ভক্তের মাঝে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশের 'ব-কলমা' গ্রহণ করার পর, গিরিশচন্দ্রের যেমন কোন পরিবর্তন হোল না তেমনি অহং বা আমিত্ব ভাবও গেল না। গিরিশ দেখলেন—এতো মহা মুস্কিল! ব-কলমা দিলাম, অথচ 'আমি' ভাবটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। পরমপুরুষ পরমহংস-দেবকে গিয়ে সোজাসুজি বললেন—'তোমাকে যে ব-কলমা দিয়ে-ছিলেম, ওটা ফেরৎ দাও।' গিরিশের কথা শুনে, পরমপুরুষ মুচ্‌কে হাসলেন একটু! তারপর বললেন—'দিয়ে ফেরৎ নিবি কি রে?' গিরিশচন্দ্র অকপটে জানালেন—মন থেকে 'আমি'টাকে তাড়াতে পারছি না। কাজেই ওটা ফেরত দিতে হবে। পরমপুরুষ সস্নেহে বললেন —'দেখ, তুই এক কাজ কর। এখন থেকে যা কিছু করবি, তাতে আমার দোহাই দিবি।' তারপর নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন— 'বলবি, উনি যা করাচ্ছেন, তাই করছি।' এর পর থেকে গিরিশচন্দ্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গুরুর নির্দেশ মত নিজেকে চালিত করেছেন।

অনেকের ধারণা গিরিশচন্দ্র গুরুকে 'ব-কলমা' দেওয়ার পর, ধর্ম-জীবন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে, কর্মজীবনে তিনি উল্লেখযোগ্য আর কোন নাটক রচনা করতে পারেন নি। কিন্তু আমরা যদি গিরিশ রচনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর, গিরিশচন্দ্র বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর রচনার মাধ্যমে।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল গিরিশচন্দ্র

জীবিত ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, ঠাকুর দেহরক্ষা করেন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, আর গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩১৮ সালের ২৫শে মাঘ রাত্রি ১-২০ মিনিটে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কখনো কোনোদিন তিনি 'ব-কলমা' দানের কথা বিস্মৃত হন নি। আমিত্ব এবং অহংভাবকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছিলেন। আর তার পরিবর্তে শেষ জীবনের সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল তিনি এই বিশ্বাসই পোষণ করে এসেছেন, তিনি যা করাচ্ছেন, তাই করছি,—তিনি যা করাবেন, তাই করব।

গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুন, আর তাঁর মৃত্যু হয় ১৩১৮ সালের ২৫শে মাঘ। অর্থাৎ তিনি ৬৭ বৎসর ১১ মাস বেঁচেছিলেন। এর মধ্যে ৩৫ বৎসর কাল নাট্য-রচনা, নাট্য-পরিচালনা ও নটরূপে নাট্যশালার সেবা করে গেছেন।

প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন কবি ও গীতিকার। কেরানীগিরিও করেছেন জীবিকা-নির্বাহের জন্য।

নাট্যশালার সংস্পর্শে এসে তিনি সবচেয়ে অভাব অনুভব করলেন নাটকের। নাট্যশালাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, সর্বপ্রথম বিভিন্ন স্বাদের ও বিভিন্ন রসের নাটকের প্রয়োজন। কিন্তু নাট্যকার কৈ? রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোল—নাটক চাই। কিন্তু নাটক পাওয়া গেল না। তখন নিজেই নাটক-রচনায় মনোনিবেশ করলেন। গিরিশ-চন্দ্রের বয়েস তখন ৩২ বছর। এই ৩২ বছর বয়স থেকে সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল তিনি অব্যাহত গতিতে নাট্য-রচনা করে গেছেন। এই পঁয়ত্রিশ বছরে তিনি নব্বইখানা ছোটবড় নাটক, তিনটি উপন্যাস এবং কিছু গল্প ও প্রবন্ধ, আর সেই সঙ্গে অসংখ্য গান ও কবিতা রচনা করে গেছেন।

১২৯৩ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ স্টার থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গল' নাটক মঞ্চস্থ হয়। আর ঐ বছরেই শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন ঠাকুর দেহরক্ষা করেন। 'বিল্বমঙ্গল' গিরিশচন্দ্রের ৩৯তম নাটক অর্থাৎ 'বিল্বমঙ্গলের' পরেও তিনি ৫১ খানি নাটক রচনা করেছিলেন। যার মধ্যে 'প্রফুল্ল'

'বলিদান', 'নসীরাম', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি-শিবাজী', 'পাণ্ডব গৌরব', 'ম্যাকবেথ', 'জনা' প্রভৃতি নাটকগুলি বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে আছে।

এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, নাট্য-রচনায় গিরিশচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে যান নি? বরং বলা যায় পরবর্তীকালে বিভিন্ন রসের ও বিভিন্ন স্বাদের নাটক রচনা করে, নাট্য-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে কালজয়ী হয়ে আছেন গিরিশচন্দ্র। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, যে 'ব-কলমা' দেওয়া দেউলে নাট্যকার, কি করে নাট্য-সাহিত্যের রস-ভাণ্ডারকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে তুললেন।

নটকুল চূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর

অর্ধেন্দুশেখর নটগুরু গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে ছয় বছরের ছোট ছিলেন। অর্ধেন্দুশেখরের জন্ম ১৮৫০ আর গিরিশচন্দ্রের জন্ম ১৮৪৪ সালে। কিন্তু অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় জীবন শুরু হয়েছে মাত্র সতের বছর বয়সে। ১৮৬৭ সালের ২রা নভেম্বর 'কিছু কিছু বুঝি' নাটকে তিনি সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এই নাটকটি ছিল যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বুঝলে কিনা' নাটকের পাণ্টা জবাব। 'কিছু কিছু বুঝি' নাটকে অভিনয় করার ফলে, অর্ধেন্দুশেখরদের সংসারে অশান্তি দেখা দেয়।

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে অর্ধেন্দুশেখরদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন মামাতো-পিসতুতো ভাই। অর্ধেন্দুশেখরের পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। যতীন্দ্রমোহনের মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তির ওপর নির্ভর কবে তাঁদের সংসার চলতো। তাছাড়া অর্ধেন্দুশেখরও ঠাকুর বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতেন। 'কিছু কিছু বুঝি' নাটকে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহনকে লক্ষ্য করে কিছু কটাক্ষপাত করা হয়েছিল। পূর্বাহ্নে একথা জানতে পেরে অর্ধেন্দুশেখরের পিতা শ্যামাচরণ পুত্রকে ঐ নাটকে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর পিতার নিষেধ সত্ত্বেও অভিনয় করায় তাঁদের সংসারে বিপর্যয় নেমে আসে। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হলেন অর্ধেন্দুশেখর আর সেই সঙ্গে বন্ধ হলো তাঁদের সংসারের মাসিক বৃত্তি।

বাল্যকাল থেকেই অর্ধেন্দু অপরের কথাবার্তার ধরনধারণ, হাবভাব, চালচলন, হুবহু নকল করতে পারতেন। তাঁর এই অনুকরণ স্পৃহার মধ্যে অভিনয় প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। অর্ধেন্দু পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারে থাকার আগে শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলে কিছুকাল

পড়াশোনা করেছিলেন। রসরাজ অমৃতলাল ছিলেন তাঁর সহপাঠী। অন্তরঙ্গ বন্ধু। অমৃতলালেরও নকল করার ক্ষমতা ছিল। অর্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে পরবর্তীকালে, ১৩৩১ সালের ২৩শে শ্রাবণ, 'নাচঘর' পত্রিকায় অমৃতলাল লেখেন—"অর্ধেন্দু আমার **class friend,** বড় ভাব ছিল। উভয়েরই নকল করিবার শক্তি ছিল। অর্ধেন্দুর সেই শক্তি বেশি ফুটিত। আমরা খেলা ও আমোদের সঙ্গে এক একজনের স্বর অনুকরণ করিতাম। এক একজনে এক একটা কিছু হইতাম। আর তদুপযুক্ত ঢং অনুকরণ করিতাম। ইহাই আমাদের অভিনয় বুদ্ধির আদি।"

পাথুরিয়াঘাটার আশ্রয় ছেড়ে আসার পর অর্ধেন্দুশেখর অন্যত্র থাকতেন। এর কিছুকাল পরে তিনি বাগবাজারে নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসেন। এই সময়ে হরলাল মিত্র লেনে একটা থিয়েটারের দল গঠন করেন বাগবাজারেরই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের কয়েকজন যুবক। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন, অর্ধেন্দুশেখরের বাল্যবন্ধু। বন্ধুদের অনুরোধে অর্ধেন্দু সেই দলে যোগ দিলেন। তখন সেখানে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র মহলা চলছিল। গিরিশচন্দ্র ছিলেন সে দলের শিক্ষক। তখন নাটকের অভিনয় অংশ বণ্টন করা হয়ে গেছে। কিন্তু যিনি কেনারামের ভূমিকায় মহলা দিচ্ছিলেন, তাঁর বলা-কওয়া, চলাফেরা চরিত্রানুগ হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত অর্ধেন্দুশেখরকে উক্ত ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য নির্বাচন করা হয়। পরে জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয়,করে তিনি স্বয়ং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের প্রশংসা লাভ করেন। এই অভিনয় সম্প্রদায়ের তখন নাম ছিল **'Bagbazar Amateur Theatre'** পবে এই শৌখিন সম্প্রদায়ের উদ্যোগেই **Public Theatre** বা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূলে অর্ধেন্দুশেখরের অবদান অবিস্মরণীয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের তিনি ছিলেন সংগঠক, নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতা। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মূলে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। বহু বাধা-বিপত্তি, বিরুদ্ধ সমালোচনা উপেক্ষা করে তিনি যদি সেদিন তাঁর

সতীর্থদের নেতৃত্ব না দিতেন, তাহলে সাধারণ রঙ্গালয় (**Public Theatre**) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। 'বঙ্গীয় নাট্য-শালার ইতিহাসে' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন—"'নীলদর্পণ'-এর প্রথম অভিনয়ানুষ্ঠানেই ন্যাশনাল থিয়েটারের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দর্শকমহল ও সমকালীন পত্র-পত্রিকা অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। অভিনয় দেখবার জন্যে দর্শক ভেঙ্গে পড়ত। এর সমস্ত কৃতিত্ব প্রাপ্য অর্ধেন্দুশেখরের। ন্যাশনাল থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ তিনি।…"

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্মলগ্নে অর্ধেন্দুশেখরের আন্তরিক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয় এই কারণে যে, গিরিশচন্দ্র সে সময় কোন সহযোগিতা করেননি, বরং এঁদের কার্যের বিরূপ মন্তব্যই করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্ধেন্দুশেখর ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তা সার্থক হয়েছিল। মাত্র এক টাকা ও আট আনা টিকিটের মূল্যে প্রথম দিনের অভিনয়ে ৭০০ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছিল। অর্ধেন্দুশেখর ও তাঁর সহযোগীরা আশার আলো দেখতে পেলেন। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর, বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্মলগ্নে এই প্রাপ্তিটুকুই ব্যাপ্তির দুয়ার উন্মোচন করলো।

'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম দিনের অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর একাই তিনটি বিশিষ্ট ও বিভিন্ন ধর্মী চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। গোলক বসু, উডসাহেব ও সাবিত্রী। প্রতিটি চরিত্রে তিনি অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। পুরুষ এবং স্ত্রী ভূমিকায় একই নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করে, একমাত্র অর্ধেন্দুশেখর একটি নজীর সৃষ্টি করে গেছেন।

নির্ভুল ইংরাজী উচ্চারণে, সাহেবী আদব-কায়দায় চলাফেরা ও অভিব্যক্তি প্রকাশে সে যুগে তাঁর সমকক্ষ আর কোন অভিনেতা ছিল না। রঙ্গজগতে তিনি আজও 'মুস্তাফী সাহেব' রূপে পরিচিত হয়ে আছেন। তাঁর সমগ্র অভিনয় জীবনে তিনি এমন অনেক তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ভূমিকায় রূপদান করে স্মরণীয় হয়ে আছেন, যা পরবর্তীকালে সেইসব

ভূমিকায় আর কেউ অভিনয় করে, তুচ্ছ বা ক্ষুদ্র চরিত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারেননি।

অভিনয় শিক্ষকরূপে তাঁর অসামান্য দক্ষতার কথা বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ১৩২৭ সালের 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র এই প্রসঙ্গে লেখেন—"অর্ধেন্দু যেমন উচ্চ শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন, সেইরূপ উচ্চ শ্রেণীর অভিনয়-শিক্ষকও ছিলেন। শুনিয়াছি যখন গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দু উভয়ে এক থিয়েটাবে থাকিতেন, শিখাইবার ভার গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুব উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তিনি বলিতেন অর্ধেন্দুর মত শিখাইবাব ক্ষমতা আমাদের কাহারও নাই।..."

এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে গিরিশচন্দ্র সুরেলা অভিনয় করতেন। অর্ধেন্দুর অভিনয় ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সুরবর্জিত অভিনয়। অথচ উভয়ে যখন একসঙ্গে অভিনয় করতেন, তখন উভয়ের অভিনয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দর্শকদের মনে তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না। ববং উভয়ের সম্মিলিত অভিনয় বিশেষ উপভোগ্যই হতো। যেমন পরবর্তীকালে নাট্যচার্য শিশিরকুমার ও অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনযেব মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা উপভোগ করেছি।

১৯০৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর, বুধবার (বাংলা ১৩১৫, ৩১শে ভাদ্র) অর্ধেন্দুশেখর পরলোকগমন করেন। মাত্র সতের বছর বয়সে তাঁর অভিনয়ের হাতেখড়ি। সুদীর্ঘ একচল্লিশ বছর তিনি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সেবা করে গেছেন। বহু বাধা-বিপত্তি, দুঃখ, কষ্টের মধ্যেও তিনি মানুষকে আনন্দ বিতরণ করে গেছেন। প্রতিভাধর অভিনেতা ও নাট্য-শিক্ষকরূপে তিনি বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে যেমন স্মরণীয় হয়ে আছেন, তেমনি বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে তাঁর কীর্তি-কাহিনী চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ও থাকবে।

রসরাজ অমৃতলাল

অমৃতলাল তের বছর বয়সে পিতৃহারা হন। অমৃতলালের পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু ছিলেন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। পরে তিনি বিশ্বম্ভর মৈত্রের আর্থিক সহায়তায় শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কৈলাসচন্দ্র শেক্সপীয়রের কাব্যের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি যখন শেক্সপীয়রের কাব্য আবৃত্তি করতেন, কিশোর অমৃতলাল তা শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। শেক্সপীয়রের রচনার সঙ্গে অমৃতলালের পরিচয় কৈশোরকাল থেকেই। মেধাবী ছাত্ররূপে শিক্ষকদের তিনি বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও তিনি অল্প বয়েস থেকে নাটক-নভেল পড়ায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। এমন কি বটতলার সাহিত্য পাঠেও তাঁর কম আগ্রহ ছিল না। কৃতী ছাত্ররূপে তিনি পুরস্কারলাভও করেছেন। কিন্তু এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েও তাঁর পক্ষে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ তখন তাঁর বয়েস মাত্র তের বছর। কাজেই এর দু'বছর পরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন।

সাহিত্য-কাব্য পাঠের প্রতি শৈশবকাল থেকে তাঁর যেমন অনুরাগ জন্মেছিল, তেমনি ঐ বয়েস থেকে তিনি কিছু কিছু কাব্য-রচনাও শুরু করেছিলেন। কিন্তু শৈশবের সঙ্গীদের নিয়ে তিনি ডাক্তার ডাক্তার খেলা করতেই ভালবাসতেন। উত্তরকালে তাঁর মনে ডাক্তার হওয়ার প্রবল বাসনা দেখা দেয়। তাই এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ডাঃ আর. জি. কর ছিলেন তাঁর সহপাঠী। বছর দুই মেডিকেল কলেজে পড়ার পর, তিনি কাশীতে গিয়ে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ লোকনাথ মৈত্রের কাছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে বাঁকিপুরে (পাটনা) চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন।

ছাত্রাবস্থায় যাঁর মনের কোণে শেক্সপীয়র বাসা বেঁধেছিল, কাব্য-সাহিত্য যাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, রোগীর জীবনের দায়-দায়িত্ব নিয়ে তাঁর পক্ষে চিকিৎসা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সাহিত্য সাধনায় ও নটনাথের সেবায়।

অমৃতলালের জন্ম ১৮৫২ ও মৃত্যু ১৯২৯ সালে। ৭৭ বছর পূর্ণ হওয়ার পরেও তিনি কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। ১৮৭২ সালে যখন সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁর বয়েস মাত্র কুড়ি বছর। কুড়ি বছরের যুবক-জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন অভিনয় কলা তথা নাট্যশালার উন্নতি সাধনে এবং সাহিত্যসেবায়।

সে সময়ে নটের বৃত্তি ছিল নিন্দনীয়। নটেরা ছিলেন সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়, তথাপি দৃঢ়চেতা অমৃতলাল লোকনিন্দা, অপবাদ সবকিছু তুচ্ছ করে নটনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নাট্যকার, নট, নাট্য-শিক্ষক এবং নাট্যশালা পরিচালনার কাজে তিনি ছিলেন সার্থকনামা। 'যাজ্ঞসেনী'র ন্যায় সাহিত্য-রস-সমৃদ্ধ কাব্য-নাট্য রচনা করলেও, তাঁর রচিত হাল্কা রসের নাটকগুলি রস-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অমৃতলাল বসু অপেক্ষা সেখানে তিনি 'রসরাজ'-রূপেই অধিক পরিচিত। তাঁর সুতীক্ষ্ণ কলমে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে—অন্যায়, অনুকরণীয় আসক্তি, অসূয়া ও বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাবু কালচারের ওপর।

সাধারণের কাছে 'রসরাজরূপে' আখ্যায়িত হলেও, তাঁর স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে রস-রচনার মাধ্যমে। স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ ছিল তাঁর অপরিসীম। স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। অপাঙ্‌ক্তেয় নোটোদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দ্বারা জনসমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুবক্তা বা বাগ্মীরূপেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বড় বড়

জনসভায় তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য শ্রোতারা উন্মুখ হয়ে থাকতেন। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে লিখেছিলেন—"তাঁহার কথায় পর্যাপ্ত রসিকতা থাকিত। কিন্তু সেগুলি প্রতিভাদীপ্ত, বাচালতা নহে, তাঁহার বক্তৃতা ছিল হিতগর্ভ। তাঁহার বক্তৃতার লক্ষ্য ছিল লোকশিক্ষা। বড় বড় বাগ্মীর বাক্য পল্লব ও আড়ম্বরময়ী ভাষা অমৃতবাবুর বক্তৃতার পর বিফল হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাঙ্গা আসর জোড়া দিতে পারিতেন এবং তাঁহার বক্তৃতার পর আর কেহ আসর জমাইতে পারিত না। যেমন কীর্তনের পর আর কথকতা জমে না।"

অমৃতলালের নাটক ও তাঁর নট-জীবনের কথা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে দেশের যে কালানুক্রমিক পরিবর্তন এসেছে, তার ভালকে যেমন তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, তেমনি মন্দকেও তিনি কঠিন হস্তে কষাঘাত করেছেন।

অমৃতলালের সামাজিক নক্সা বা প্রহসনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কটাক্ষ করে হাস্যরসের অবতারণা করতে দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন 'হিতবাদী' পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতৃস্থানীয় সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পারিবারিক কলঙ্ক রটনা করে 'রুচি-বিকার' নামে কবিতা রচনা করেন, তখন অমৃতলাল তাঁর 'অবতার' নাটকে কাব্যবিশারদকে কাব্যবিষরদ ও 'হিতবাদী' পত্রিকাকে 'সুবচনী' নামে আখ্যায়িত করে শ্লেষাত্মক চরিত্র সৃষ্টি করেন। অমৃতলাল তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অন্যায়েব প্রতিবাদ করতে কখনই দ্বিধা করেননি।

গিরিশচন্দ্র বরাবরই রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিমুখ ছিলেন। অমৃতলালও প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি রবীন্দ্র-কাব্য ও নাট্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তিনি কোনো বিষয়েই গোঁড়া ছিলেন না। গোঁড়ামিকে প্রশ্রয়ও দিতেন না, গোঁড়ামি পছন্দও করতেন না। যুগধর্মকে কোনদিন তিনি অস্বীকার করেননি। বিগত দিনের ভালমন্দের যেমন সমালোচনা করেছেন,

তেমনি কালের পরিবর্তনে যাকে ভাল বলে মনে করেছেন, তাকে স্বাগত জানাতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নামক নাটকের অভিনয় দেখে, তিনি ১৯২৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের **Indian Daily News** পত্রিকায় **'Visarjan—An appreciation'** নামে ইংরাজীতে একটি সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। এই আলোচনায় শুধু তিনি নাটক ও তার অভিনয়েরই প্রশংসা করেননি, সেই সঙ্গে তিনি গতানুগতিক নাট্য-প্রযোজনার ভিন্নরূপ দেখে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এখানে সেই সুদীর্ঘ আলোচনার সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। —"So, when one heard that cast included amateurs, mostly members of the house, one anticipated a real treat. But as the play progressed, I felt that I, an old stage-horse, was receiving object lessons in the art of acting···," ইংরাজীতে লেখা এই অপূর্ব সমালোচনা পড়ে, কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় দেখার প্রবল আগ্রহ হয়। তিনি অমল হোমকে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় দেখার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য এক পত্রে লেখেন—

বাজেশিবপুর, হাওড়া
১২ই ভাদ্র ১৩৩০

অমল,

আমাকে বিসর্জনটা দেখাও। তোমাদের কাগজে ভুনি বোসের প্রশংসাটা পড়ে যেতে না পারার দুঃখটা আরও যেন বেড়ে গেল। আচ্ছা, ও লেখাটা সত্যি করে বল তো কার? অমন ইংরাজী কি ও বুড়ো লিখতে পারে? এ যে রীতিমত মুন্সিয়ানা।

তোমাদের
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এখন সাধারণ রঙ্গালয়ের বয়স হলো ১১২ বছর। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাব সময় থেকে সুদীর্ঘ ৫৭ বছর অমৃতলাল জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় বহু পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটেছে। প্রাজ্ঞ অমৃতলাল তা লক্ষ্য করেছেন। তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাই 'বিসর্জনে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে নিজেকে মঞ্চের 'বুড়ো ঘোড়া' বলতেও কুণ্ঠিত হননি।

অমৃতলালের মৃত্যুর পর নাট্যমঞ্চের যুগন্ধর নাট্যাচার্য শিশিরকুমাব তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন —"তিনি নটশ্রেষ্ঠ ছিলেন, নটনায়ক ছিলেন, তাই তিনি নটজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন, সমাজের কাছ থেকে তার সম্মান আদায় কবে নিয়েছিলেন। এ কাজ আব কারুব দ্বারা হয়নি—স্বয়ং গিরিশচন্দ্র পারেননি। তিনি সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু অমৃতলাল সমাজের সঙ্গে মিশে নটের সম্মান আদায় করেছিলেন। অমৃতলাল তাঁব অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে নটকে জাতির মধ্যে বসিয়েছিলেন···।"

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের উক্তিব পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসংশয়ে বলা চলে, আজ সমাজে নটের যে সম্মান— তা আদায় কবে এনে দিয়েছিলেন—রসের কারবারী রসরাজ অমৃতলাল।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

প্রোসিনিয়াম স্টেজে বাংলা নাটক অভিনয়ের সূচনাকাল থেকেই বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মঞ্চ-মায়ায় জড়িয়ে পড়েন। ১৮৪০ সালে বিহারীলাল উত্তর কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঝাঁপ্পালাল চট্টোপাধ্যায়। বিহারীলাল আলেকজাণ্ডার ডাফের স্কুলের একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর সহপাঠী। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন কোন সওদাগরী অফিসে ও রেল বিভাগে চাকুরি করেন।

অভিনয়-কলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। ১৮৫৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালায়, ১৮৫৯ সালে মেট্রোপলিটন থিয়েটারে এবং ১৮৬৭ সালে শোভাবাজার নাট্যালয়ে যথাক্রমে 'রত্নাবলী', 'বিধবা বিবাহ' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে অভিনয় করেন। প্রতি নাটকেই তিনি তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

শোভাবাজার নাট্যালয়ে অভিনয়ের পাঁচ বছর পরে ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আট মাস পরে ১৮৭৩ সালের ১৬ই আগস্ট বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত ধনকুবের আশুতোষ দেবের (সাতুবাবু) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। শরৎচন্দ্র সাতুবাবুর বাড়িতে অভিনীত 'শকুন্তলা' ও 'মহাশ্বেতা' নাটকে শকুন্তলা ও তরলিকার ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। অভিনয় দক্ষতা ছাড়াও তাঁর অনেক গুণ ছিল। পাখোয়াজ বাজনায় তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল। পাখোয়াজের অনেক বোল তিনি রচনা করেছিলেন। সে যুগে ঘোড়সওয়ার হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শ অনুসারে তিনি বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয় শুরু করেন। এর জন্য তাঁকে বহু বিপদ

সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে বিহারীলাল নট, নাট্যকার ও নাট্য-নির্দেশকরূপে বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বেঙ্গল থিয়েটারের প্রাণপুরুষ। কিরণচন্দ্র দত্ত তাঁর নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে বিহারীলাল সম্পর্কে লিখেছেন—"বিহারীলালের জীবন অর্থে বঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যশালা **Bengal Theatre**-এর জীবন বুঝায়।"

বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র ঘোষ ১৮০০ সালে অর্থাৎ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সাত বছর পরে পরলোকগমন করেন। এরপর বিহারীলাল সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার পরিচালনা করতে থাকেন। বেঙ্গল থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল সুদীর্ঘ আটাশ বৎসর। এই সুদীর্ঘকাল বিহারীলালের একনায়কত্বে বেঙ্গল থিয়েটার বহু নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

এই সময়ে বিহারীলাল একদিকে যেমন বহু মৌলিক নাটক রচনা করেছেন, অপরদিকে তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসেরও নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নাট্যরূপায়িত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দুর্গেশ-নন্দিনী', 'রজনী', 'সীতারাম' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'দেবী চৌধুরাণী'র নাট্যরূপও বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছে। তবে শেষোক্ত উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ বিহারীলাল দিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে সংশয় আছে। যাই হোক, বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে রসরাজ অমৃতলাল তাঁর এক প্রবন্ধে লেখেন —"যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা সাহিত্যগুরু বলে থাকি, থিয়েটারই তাঁকে সাধারণের চোখের সামনে ফুটিয়ে দিয়েছে। বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'বিষবৃক্ষ' তখন বড় বেশী লোকের ভাগ্যে পড়া ঘটতো না। বেঙ্গল থিয়েটার সর্বপ্রথম 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকাকারে পরিবর্তিত করে বঙ্কিমবাবুকে সাধারণের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।"

বলা বাহুল্য, বিহারীলাল প্রদত্ত 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ সে সময়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৭৪ সালের ৭ই জানুয়ারী **Indian Daily News** পত্রিকায় লেখা হয়—"**···The parts of Jugut Sing, Osman and Beerendro Sing specially were acted to the full and entire satisfaction of the audience. The others also did their parts of the work well and cleverly··· could be so trained, could be made to enter, as it were into the soul of the characters they represented could be disciplined to sustain intelligently and truthfully the most difficult parts was what we could not believe···**"

বিহারীলালের অধিকাংশ মৌলিক নাটক পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'সুভদ্রা হরণ', 'রাবণবধ', 'পাণ্ডব নির্বাসন', 'শ্রীবৎসচিন্তা', 'রুক্মিণীরঙ্গ', 'প্রভাস মিলন', 'নন্দ বিদায়', 'জন্মাষ্টমী', 'সীতা-স্বয়ংবর', 'বাণযুদ্ধ', 'মোহ-শেল', 'ব্যাসকাশী', 'হরি-অন্বেষণ', 'ধ্রুব' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকগুলি বিহারীলাল মঞ্চের প্রয়োজনে রচনা ও প্রযোজনা করেছেন। নাট্যকার অপেক্ষা সে যুগে প্রযোজকরূপে বিহারীলালের সর্বাধিক খ্যাতি ছিল। বিহারীলাল প্রহসনধর্মী কয়েকটি শ্লেষাত্মক সামাজিক নাটিকাও রচনা করেন। তন্মধ্যে তাঁর 'মুই হ্যাঁদু' নামক নাটিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'মুই হ্যাঁদু'-র সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৯৪ সালে ২৭শে জানুয়ারী তারিখে 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় লেখা হয় "···'মুই হাঁদু'—ভণ্ড হিঁদুয়ানীর পঞ্চ-চিত্র-সামাজিক-সঙের প্রতিচ্ছায়া। মুখে 'হিঁদুয়ানী' 'হিঁদুয়ানী' করেন কিন্তু কাজের বেলায় ম্লেচ্ছের বেহদ্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—সমাজ-সঙের এমনই কারখানা। রঙ্গভূমি 'মুই হ্যাঁদু' পঞ্চ রং-এ এই কারখানাই দেখাইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে ঘৃণা হইয়াছে, দেখিতে

দেখিতে মুখে চুনকালী দিতে ইচ্ছা হইয়াছে। এমন সত্ত্বও আঁকিতে আছে গা! কিন্তু তবুও তো হতভাগ্যদের মুখ পোড়ে না! এ নিদারুণ কষাঘাতেও তো মতিচ্ছন্নের মতিবিভ্রম ঘুচে না?" ইত্যাদি সমালোচনা পড়িয়া মনে হয়, বিহারীলালের এ নাটিকাটি সে যুগে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

নট, নাট্যকার ও মঞ্চাধ্যক্ষ বিহারীলাল মঞ্চ-পরিচালনার কাজে সে যুগে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা, সে যুগে সীমিত সংখ্যক দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য নিত্যনতুন নাটক তাঁকে মঞ্চস্থ করতে হয়েছে। শুধু নাটক প্রযোজনা বা পরিচালনা করাই নয়, সেই সঙ্গে দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্য মাঝে মধ্যে তাঁকে অভিনব বিজ্ঞাপনও রচনা করতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'র নাট্যরূপ দিয়ে তিনি কবিতায় যে হ্যাণ্ডবিলটি বিতরণ করেন, তাতে তাঁর কবিচিত্তের অপরূ একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়—

"চোখে চোখে ভালবাসা পদ্মপাতা জল।
ক্ষণে চায় ক্ষণে ধায় নিরাশ কেবল॥
মনে মনে ভালবাসা প্রেম বলে গনি।
প্রেমের প্রতিমা অন্ধ দুঃখিনী রজনী॥"

বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে 'পশুক্লেশ নিবারণী' সমিতির সাহায্যকল্পে ১৮৭৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয় উপলক্ষ্যে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন, লেডী লিটন ও স্যার রিচার্ড টেম্পল্ বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় দেখতে আসেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর, ১৮৯০ সালে যুবরাজ প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে গড়ের মাঠে যে রাজকীয় অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়, তাতে বিহারীলালের উদ্যোগে বেঙ্গল থিয়েটার 'শকুন্তলা' নাটকের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করে রাজকীয় সম্মানলাভ করেন এবং এর পর থেকে বেঙ্গল থিয়েটার 'রয়েল বেঙ্গল' নাম ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে

পত্রিকায় লেখা হয়—"গড়ের মাঠে রাজপৌত্রের সমক্ষে অভিনয় করিয়া 'বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানী' বড়ই যশঃ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজদরবার হইতে কোম্পানীকে নানা প্রশংসাবাদ প্রদত্ত হইতেছে।"

বিহারীলাল ৩৩ বছর বয়সে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করে সুদীর্ঘ আটাশ বছর কাল অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে বেঙ্গল থিয়েটার পরিচালনা করেন। ১৯০১ সালের ২০শে এপ্রিল ৬১ বছর বয়সে বিহারীলাল পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল থিয়েটার তথা রয়েল বেঙ্গলেরও অবলুপ্তি ঘটে।

সুকুমারী দত্ত (গোলাপসুন্দরী)

১৮৭২ সালে বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ঠিক এক বছর পরে, ১৮৭৩ সালে উত্তর কলিকাতার বিখ্যাত ধনাঢ্য ও সম্মানীয় ব্যক্তি আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) মহাশয়ের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করার সময় শরৎচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর ও সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় মাইকেল মধুসূদনের প্রস্তাব অনুযায়ী সাধারণ রঙ্গালয়ে স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করার জন্য অভিনেত্রী লওয়ার ব্যবস্থা হয়। মাইকেল মধুসূদন এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, স্ত্রীচরিত্রে পুরুষদের দ্বারা অভিনয় করালে কখনই তা স্বাভাবিক অভিনয় হতে পারে না। শরৎচন্দ্র মাইকেলের অভিমত সানন্দে গ্রহণ করায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ ব্যাপারে বিরূপ অভিমত প্রকাশ করেন এবং রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর যে সমর্থন ছিল, তা তিনি প্রত্যাহার করে নেন এবং সেইসঙ্গে রঙ্গালয়ের সংস্রব পরিত্যাগ করেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম থেকে অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয় করার জন্য নিষিদ্ধ পল্লী থেকে চারজন অভিনেত্রীকে সংগ্রহ করেন। রঙ্গালয়ের প্রথম চারজন অভিনেত্রী হলেন গোলাপ-সুন্দরী, এলোকেশী, জগত্তারিণী এবং শ্যামা।

গোলাপসুন্দরী শ্রীরামপুর মাহেশের কাছে তাঁর মায়ের সঙ্গে বাস করতেন। চেহারাটি ছিল অভিনেত্রীর উপযোগী। সুন্দরী, সুশ্রী এবং সুকণ্ঠের অধিকারিণী ও ভরা যৌবনা। ১৮৭৩ সালের ১৬ই আগস্ট বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বারোদঘাটন হয় মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক নিয়ে। এই নাটকে গোলাপসুন্দরী নাম ভূমিকায় অবতরণ করেন। প্রথম অভিনয়েই তিনি দর্শকদের কাছে অকুণ্ঠ প্রশংসা

লাভ করেন। এর পর থেকে গোলাপসুন্দরী মাইকেলের 'মায়াকানন', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে সার্থকনামা অভিনেত্রীরূপে চিহ্নিত হন। ১৮৭৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' নাটকাকারে বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকে গোলাপসুন্দরী বিমলার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। ক্রমশ গোলাপসুন্দরী অভিনেত্রীরূপে সে যুগের রঙ্গালয়ে সার্থকনামা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেন।

বেঙ্গল থিয়েটারে যখন অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয় শুরু হয়েছে, তখনও কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটারে স্ত্রীভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করে চলেছেন। এরই মাঝে নানা বিপর্যয়ের মধ্যে ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিকানাব পরিবর্তন হয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের নাম হয় 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। এদিকে ১৮৭৪ সালের ২২শে আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটক মঞ্চস্থ হয়। 'পুরুবিক্রম' নাটকে গোলাপসুন্দরী রাণী ঐলবিলার ভূমিকায় অভিনয় করেন। গোলাপসুন্দরীর জীবনে এটি একটি স্মরণীয় অভিনয়। নাট্যশালাব প্রথম যুগে যে চারজন অভিনেত্রী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে গোলাপসুন্দরীই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে রূপান্তরিত হওয়ার পরেও বেশ কিছু দিন স্ত্রীভূমিকাগুলি পুরুষদের দ্বারাই অভিনয় করানো হয়েছে। এরপরে অবশ্য বেঙ্গল থিয়েটারের সাফল্য দেখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে, স্ত্রীভূমিকাগুলিতে অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনয় করানো শুরু হয়। ১৮৭৫ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন উপেন্দ্রনাথ দাস।

উপেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজ থেকে সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং র‍্যাডিক্যাল লীগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের কাজে তাঁর

বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তিনি সমাজ সংস্কারের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে এবং বহির্বঙ্গের বহু জায়গায় সভা সমিতির অনুষ্ঠান করে বক্তৃতা দিতে থাকেন। কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন উপেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। তাঁর সহায়তায় উপেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পারচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে সমাজসেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই সময় গোলাপসুন্দরী উপেন্দ্রনাথের গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৮৭৫ সালের ২রা জানুয়ারী উপেন্দ্রনাথ তাঁর স্বরচিত নাটক 'শরৎ সরোজিনী' গ্রেট ন্যাশনালে মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকটিতে একজন ইংরেজ জেলা শাসকের অত্যাচার দেখানো হয়েছিল। 'শরৎ সরোজিনী' নাটকের নায়িকা সুকুমারীর ভূমিকায় গোলাপসুন্দরী এমনই প্রাণবন্ত অভিনয় করেন যে, শেষ পর্যন্ত গোলাপসুন্দরী জনসমাজে 'সুকুমারী' নামেই পরিচিতা হয়ে উঠেন। উপেন্দ্রনাথের এই নাটকটির অভিনয় ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দেন। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ কিছুমাত্র ভীত না হয়ে ইংরেজ সরকারকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে আরো কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। উপেন্দ্রনাথ রচিত এই সব নাটকে গোলাপসুন্দরী কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করতে থাকেন। তখন আর তিনি গোলাপসুন্দরী নন, নাটকের প্রচারপত্রে তখন গোলাপ-সুন্দরীর পরিবর্তে 'সুকুমারী' নামই ব্যবহৃত হতে থাকে।

অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয় করার জন্য সে যুগে যে সব ভদ্র-সন্তানেরা অভিনয়ের কার্যে অথবা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা একরকম সমাজে পরিত্যক্ত হয়েই থাকতেন বলা চলে। ঐ সময় উপেন্দ্রনাথের মনে হয় যে, বারাঙ্গনাদের যদি বিবাহ দিয়ে ঘর-সংসারী করে তোলা যায়, তাহলে হয়তো সমাজের চোখে অভিনয় শিল্পী তথা অভিনেত্রীরা মর্যাদা লাভ করতে পারেন। উপেন্দ্রনাথের দলে গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামে একজন সুদর্শন, অল্পবয়স্ক অভিনেতা ছিলেন। গোষ্ঠবিহারী

ছিলেন কলিকাতার একটি বিশিষ্ট ধনী সুবর্ণবণিক পরিবারের সন্তান। উপেন্দ্রনাথ গোষ্ঠবিহারীর সঙ্গে ১৮৭২ সালের তিন আইন (**Act III 1872**) অনুসারে সুকুমারী বা গোলাপসুন্দরীর বিয়ে দেন। এরপর থেকে গোলাপসুন্দরী মিসেস্ সুকুমারী দত্ত নামে পরিচিতা হয়ে ওঠেন।

সুকুমারীর এই বিবাহকে উপলক্ষ্য করে সেই সময়কার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্যের ঝড় বয়ে যেতে থাকে।

কোন পত্রিকায় সুকুমারীকে উপলক্ষ্য করে নিম্নলিখিত ছড়াটি প্রকাশিত হয়।

"আমি সখের নারী সুকুমারী
স্ত্রী পুরুষে এ্যাক্টো করি
দুনিয়ার লোক দেখে যা রে—"

বিবাহের পর গোষ্ঠবিহারী আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। ভদ্রপল্লীতে সুকুমারীকে নিয়ে সংসার পাতেন এবং অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে উপেন্দ্রনাথ গুরুতর ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হন এবং থিয়েটারের কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন। উপেন্দ্রনাথ এই সময় নিদারুণ অর্থ কষ্টের সম্মুখীন হন। উপেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীনাথ দাস ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা উকিল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু। উপেন্দ্রনাথের থিয়েটার করা বা অন্যান্য আচার-আচরণের জন্য শ্রীনাথ দাস ও বিদ্যাসাগর মহাশয় উপেন্দ্রনাথের প্রতি খুবই বিরূপ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর চেষ্টায় বিদ্যাসাগর মহাশয় উপেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। উপেন্দ্রনাথকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীনাথ দাসকে নানাভাবে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত পিতা-পুত্রের (শ্রীনাথ ও উপেন্দ্রনাথের) মিলন ঘটান। উপেন্দ্রনাথকে সুস্থ করে তুলে শ্রীনাথ দাস উপেন্দ্রনাথকে বিলেত পাঠিয়ে দেন।

উপেন্দ্রনাথ বিলেত যাওয়ার পর আত্মীয়-স্বজনের ধিক্কার ও গঞ্জনায়

অতিষ্ঠ হয়ে, গোষ্ঠবিহারী নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত জাহাজের খালাসী হয়ে গোষ্ঠবিহারী উপেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে বিলেতে পাড়ি দেন। উপেন্দ্রনাথ তাঁকে বিলেতে একটি হোটেল বয়ের কাজ জুটিয়ে দেন। এর কিছুকাল পরে গোষ্ঠবিহারী বিলেতেই মারা যান। এদিকে সুকুমারী অসহায় রিক্ত অবস্থায় দিন কাটাতে থাকেন। এই সময় সুকুমারীর একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কন্যা জন্মাবার পূর্বে ও পরে, বেশ কিছুদিন সুকুমারীকে নাট্যশালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়। এই সময়ে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়ের জন্য তিনি 'অপূর্ব সতী' নামে একটি সামাজিক নাটক রচনা করেন। বহু নাটকে অভিনয় করতে করতে ভাষা আয়ত্ত করার ফলে, তাঁর যে সাহিত্য বোধ জন্মেছিল তারই ফলশ্রুতি এই 'অপূর্ব সতী' নাটক।

এই নাটকটি ১৮৭৫ সালের ২৩শে আগস্ট গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়।

'অপূর্ব সতী' নাটকটি বিয়োগান্ত। কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয় মোটামুটি এই রকম—নায়িকা বারাঙ্গনা কন্যা। কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখেছে। মায়ের ইচ্ছা, মেয়েকে কোনো লেখাপড়া জানা ছেলের হাতে সমর্পণ করেন। বহু চেষ্টায় সেই রকম একটি ছেলেকে মা টোপ্ ফেলে ধরেন। ভাব-ভালবাসা যখন উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে, তখনই এসে জুটল এক বিত্তবান ব্যক্তি। মা অর্থের লোভে মেয়েকে তাঁর অধীনেই রাখতে চান। এই কারণে মেয়ের অন্তর্বেদনা ও মৃত্যু-বরণ। নাটকটি পঞ্চমাঙ্ক। প্রথম অঙ্কে দু'টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে দু'টি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে চারটি দৃশ্য এবং পঞ্চমাঙ্কে তিনটি দৃশ্য। মুদ্রিত মোট পত্র সংখ্যা ৯০। স্ত্রীচরিত্র প্রধান ১০টি, পুরুষ চরিত্র ৮টি। এছাড়া আরও ১০/১২টি পার্শ্ব চরিত্র আছে। নাটকটির উৎসর্গপত্রে লেখা আছে—

বঙ্গ-বিদ্যা হিতৈষিণী

মহারাণী

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী

মহাশয়ার

করকমলে

এই

হীনজন প্রণীত

নাটকখানি

উপহৃত

হইল।

নাটকের কভাব পৃষ্ঠা বা মলাট এইরূপ ঃ—

"অপূর্ব সতী"

নাটক

CASTUS MIRABILIS

শ্রীমতী সুকুমাবী দত্ত

দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত।

TRAGEDY!

TRAGEDY!

TRAGEDY!

CALCUTTA

নূতন ভাবত যন্ত্রে

শ্রীরাম নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত

১২৮২

All rights reserved

Price One Rupee

মূল্য এক টাকা মাত্র।

নাটকটির মুখবন্ধরূপে একটি পৃষ্ঠার শিবোনামায় লেখা হয়েছে— "অগ্রদৃষ্ট"।

এই 'অগ্রদৃষ্ট' পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি। লেখা হয়েছে পাঠিকাগণের উদ্দেশ্যে। এখানে 'অগ্রদৃষ্ট' থেকে সুকুমারীর ভাষার নমুনা হিসেবে আংশিক উদ্ধৃত করে দেওয়া হল ঃ—

"পাঠিকাগণ!

চকিত দৃষ্টিগত সুপ্রসাধিত কদাকৃতিত্ত্বলোচন—বিনোদ হয়,—তাহার কারণ কি? ভূষাই তাহার একমাত্র নিদান। কিন্তু ভূষা কয় প্রকার? আস্বাদালোচ্য দ্বিবিধ। প্রথম—সর্বানন্দ আপাত-মনোরম, দ্বিতীয়—বোধসাধ্য দেবরঞ্জন। বিচ্যুত জ্যোতি কিছুই সুখপ্রদ নহে। ভগিনীগণ! তোমরা এমন কোন্ জ্যোতি প্রার্থী? তোমরা শিক্ষিতা, উন্নতমনা, তোমাদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মন এমন কোন্ ভূষা প্রত্যাশী? প্রথম—সিঞ্জম আত্মরঞ্জন, দ্বিতীয় জগত—ত্রিজগত, তবে কি প্রথমে অভিলাষিণী? না-উচ্চশিক্ষা কখনই এত নিম্নদৃষ্টি নয়—" ইত্যাদি।

সুকুমারীর এই ভাষাবোধ সত্যই বিস্ময়কর। 'অপূর্ব সতী' ছাড়া সুকুমারীর আর কোন রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। গোষ্ঠবিহারীর সঙ্গে বিবাহের পর, সুকুমারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং সেই সময়ে তিনি এই নাটক রচনা করেন। মনে হয়, অভিনয় না করেও গৃহবধূরূপে নেপথ্যে থেকে রঙ্গমঞ্চের সেবা করার উদ্দেশ্যে তিনি নাট্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু এ আশা তাঁর পূর্ণ হয়নি। শেষ পর্যন্ত নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পুনরায় সুদীর্ঘকাল তাঁকে অভিনেত্রীর জীবন যাপন করতে হয়েছিল। নাট্য-রচয়িত্রী সুকুমারী বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বিলুপ্ত প্রায়। কিন্তু নাট্যশালার ইতিহাসে অভিনেত্রী সুকুমারী নানা কারণে আজও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, তিনিই প্রথম মহিলা নাট্যকার।

বিনোদিনী দাসী

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ঊষালগ্নে অভিনেত্রী বিনোদিনীর আবির্ভাব। ১৮৭৪ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'বেণী সংহার' (শত্রু সংহার) নাটকে দ্রৌপদীর সখীরূপে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় প্রথম মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। এই মঞ্চে অভিনয় করতে আসার পিছনে তাঁর পরিবারের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার কথা তিনি আত্মস্মৃতিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৯নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে বিনোদিনীর মাতামহীর একটি বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে খানকতক খোলার ঘর ছিল। সেই ঘরগুলি ভাড়া দিয়ে কোনরকমে তাঁদের সংসার চলত। তিনি তার আত্মজীবনীর এক জায়গায় লিখেছেন, "আমার মাতামহী একটি মাতৃহীনা আড়াই বৎসর বয়সের বালিকার সহিত আমার পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ভ্রাতার বিবাহ দিয়া তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কারাদি ঘরে আনিলেন। তখন অলঙ্কার বিক্রয়ে আমাদের জীবিকা চলিতে লাগিল। কারণ ইহার অগ্রে মাতামহী ও মাতাঠাকুরাণীর যাহা ছিল তাহা সকলই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।" বিনোদিনীর মাতামহীর ঐ বাড়িতে ভাড়াটিয়াদের মধ্যে গঙ্গামণি বা গঙ্গা বাঈজী নামে একজন সুগায়িকা বাস করতেন। বিনোদিনীর বয়স তখন ৭/৮ বৎসর। বিনোদিনীর দিদিমা বিনোদিনীকে গান শেখাবার জন্য গঙ্গামণিকে অনুরোধ করেন। বিনোদিনীর চেহারাটি ছিল খুব সুশ্রী। দুঃখের সংসারে এমন সুদর্শনা কিশোরী প্রায় দুর্লভ। তাই গঙ্গামণি কিশোরী বিনোদিনীকে আদর করে 'গোলাপ ফুল' বলে ডাকতেন। গঙ্গামণি ন্যাশনাল থিয়েটারে সেই সময় গায়িকা ও অভিনেত্রীরূপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। গঙ্গামণির হৃদয়টি ছিল অতি কোমল। বিনোদিনীদের দুঃখকষ্ট দেখে একদিন তাঁর দিদিমাকে ডেকে বলেন, "তোমার নাতিনীটিকে থিয়েটারে দেবে? এখন জলপানি বলে কিছু টাকা পাবে। তারপর,

কাজকর্ম শিখলে একটা মাইনা হবে।" গঙ্গামণির প্রস্তাবে বিনোদিনীর দিদিমা সানন্দে রাজী হন। শেষ পর্যন্ত তাঁরই চেষ্টাতে বিনোদিনী মাসিক দশ টাকা মাইনেতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রবেশ করেন। এইভাবেই শুরু হয় তাঁর অভিনেত্রী জীবন। প্রথমে নির্বাক ভূমিকায়, তারপর দু-একটি নাটকে সামান্য কিছু সংলাপ বলার সুযোগ আসে। এইভাবে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নায়িকার ভূমিকায় রূপদান করার সুযোগ পান। বিনোদিনীর গড়নটি ছিল বাড়ন্ত। তাই কৈশোরের শেষ প্রান্তে এসে, ভরাযৌবনা নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় কবার জন্য মঞ্চেব কর্তৃপক্ষরা তাঁকে সুযোগ দেন।

বিনোদিনী আনুমানিক ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অভিনয়-জীবন মাত্র ১২ বৎসর। এই ১২ বৎসরের অভিনয়-জীবনে তিনি পঞ্চাশটি নাটকে ষাটটির বেশি চরিত্রে রূপদান করে, তাঁর অভিনেত্রী জীবনকে স্মরণীয় করে রেখে গেছেন। ১১/১২ বছর বয়সে তিনি থিয়েটারে যোগদান করেছিলেন। আব ২৩/২৪ বছর বয়সে যখন তিনি শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর আসনে আসীন, সেই সময় চিরদিনের জন্য রঙ্গালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে আজ পর্যন্ত এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি নাটকের বহুবিধ চরিত্রে রূপদান করে আর কেউ দর্শকদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করে যেতে পারেননি। এই ১২ বছরে তিনি গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ১৮৭৪ ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৬ ডিসেম্বর, বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৬ ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৭ জুলাই, ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৭ জুলাই থেকে ১৮৮৩ জুলাই, এবং স্টার থিয়েটারে ১৮৮৩ জুলাই থেকে ১৮৮৬ ডিসেম্বর। এই চারটি থিয়েটারে তাঁর বার বছরের কর্মজীবন শেষ হয়েছে।

কেন যে তিনি চিরদিনের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন, তা আজও অনেকের কাছে রহস্যজনক। তবে অভিনেত্রীর জীবনযাপন অপেক্ষা সাংসারিক জীবনযাপনের প্রতি তাঁর বরাবরই ঝোঁক ছিল। এ কথা তাঁর আত্মজীবনীতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, পরোক্ষভাবে

লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

"শুনিয়াছি আমারও বিবাহ হইয়াছিল এবং এই কথাও যেন মনে পড়ে যে আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় একটি সুন্দর বালক ও আমার ভ্রাতা, বালিকা ভ্রাতৃবধূ, আর আর প্রতিবেশিনী বালিকা মিলিয়া আমরা একত্রে খেলা করিতাম। সকলে বলিত ঐ সুন্দর বালকটি আমার বর। কিন্তু কিছুদিন পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। শুনিয়াছি আমার একজন মাসশাশুড়ী ছিলেন। তিনিই আমার স্বামীকে লইয়া গিয়াছিলেন। আর আসিতে দেন নাই। সেই অবধি আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। লোকপরম্পরায় শুনিতাম যে তিনি বিবাহাদি করিয়া সংসার করিতেছেন। এক্ষণে তিনিও আর সংসারে নাই।" তাঁর বালিকা জীবনের এই ঘটনার পর প্রথম যৌবনে এক ধনী জমিদার পুত্রের সঙ্গে তাঁর ভাব ভালবাসা হয়। ঐ জমিদার-পুত্র বিনোদিনীকে বিবাহ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের চাপে জমিদারপুত্র অন্যত্র বিবাহ করেন। এই ঘটনায় বিনোদিনী খুবই আঘাত পান। এমন কি সেই আঘাত কাটিয়ে উঠা তাঁর পক্ষে বহুদিন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

১৮৮৬ সালে যে সময় তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করেন, সে সময় তাঁর জীবনে চতুর্থ পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। যিনি স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তাঁকে তাঁর নিজগৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। জীবনের একত্রিশটি বছর গৃহবধূরূপে তাঁর সঙ্গে সংসার জীবনযাপন করেছেন।

এরই মাঝে বিনোদিনীর রূপমুগ্ধ গুর্মুখ রায় মুসাদ্দি নামে জনৈক মাড়োয়ারী যুবক বিনোদিনীকে সঙ্গিনীরূপে পাওয়ার সর্তে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসুর কাছে একটি নতুন থিয়েটার করার প্রস্তাব দেন। এই থিয়েটার গড়ে তোলার ব্যাপারে গুর্মুখ যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবেন বলে জানান। গুর্মুখের প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল বিনোদিনীকে গুর্মুখের অধীনে থাকার জন্যে অনুরোধ

করেন। এ সম্পর্কে বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"অভিনেতারা আমাকে অতিশয় জেদের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, 'তুমি যে প্রকারে পার একটি থিয়েটার করিবার সাহায্য কর।' থিয়েটার করিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না। তবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যায়রূপে আর একজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি বাধা দিতে লাগিল। এদিকে থিয়েটারের বন্ধুগণের কাতর অনুরোধ। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। সঙ্কল্প দৃঢ় হইল, গুর্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম।"—এই গুর্মুখ রায় মুসাদ্দি বিনোদিনীর জীবনে তৃতীয় পুরুষ, যিনি বিনোদিনীকে কাছে পাওয়ার পর, এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিনোদিনী সে টাকার প্রলোভন ত্যাগ করে থিয়েটার গড়ে তোলার জন্যে গুর্মুখকে অনুরোধ করেন। এ সম্পর্কে বিনোদিনী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন—"আমি থিয়েটার ভালবাসিতাম, সেই নিমিত্ত ঘৃণিতা বারনারী হইয়াও অর্ধ লক্ষ টাকার প্রলোভন তখনই ত্যাগ করিয়াছিলাম।"

এখানে বহু বিতর্কিত গুর্মুখ সম্পর্কে সুদীর্ঘকাল যে ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়ে এসেছে, তা নিরসনের আবশ্যক মনে করি। গুর্মুখ রায়ের পুরা নাম গুর্মুখ রায় মুসাদ্দি। 'মুসাদ্দি' গুর্মুখের পদবী। আর 'রায়' শব্দটি পুরা নামের মধ্যবর্তী শব্দ। যেমন আমাদের নামের সঙ্গে 'নাথ' 'কুমার' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেই রকম। গুর্মুখের জন্ম ১৮৬৪ সালে আর বিনোদিনীর জন্ম ১৮৬৩ সালে। গুর্মুখ বয়েসে বিনোদিনী অপেক্ষা মাত্র বছর খানেকের ছোট ছিলেন। ১৮৮৩ সালের ২১শে জুলাই স্টার থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয় 'দক্ষযজ্ঞ' নাটককে নিয়ে। এর পর দ্বিতীয় নাটক 'ধ্রুব চরিত্র' এবং তৃতীয় নাটক 'নল দময়ন্তী' মঞ্চস্থ হয় ১৮৮৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর।

এরপরই গুর্মুখের মা রূপাদেবী ছেলের চারিত্রিক অধঃপতন এবং থিয়েটারের ব্যবসা করার কথা জানতে পেরে বিচলিত হয়ে পড়েন।

শেষ পর্যন্ত আত্মীয়স্বজনের চাপে গুর্মুখ থিয়েটার বিক্রয় করে দেন এবং বিনোদিনীর সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিনোদিনীর সঙ্গে গুর্মুখের সম্পর্ক মাত্র ছ'মাসের। কিন্তু বিনোদিনীকে তিনি ভুলতে পারেন নি। গুর্মুখ ছিলেন পিতামাতার একমাত্র সন্তান এবং বিশাল সম্পত্তির অধিকারী। হোড় মিলার কোম্পানীর তাঁরা ছিলেন বেনিয়ান। থিয়েটার এবং বিনোদিনীর সম্পর্ক ত্যাগ করার পর গুর্মুখ মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। হোড় মিলার কোম্পানীর অফিসে কিছুদিন যাতায়াত করার পর তিনি কাশীতে চলে যান। সাধুসঙ্গ লাভ করেন এবং ১৮৮৬ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে মারা যান। গুর্মুখের ১৭/১৮ বছর বয়সে বিবাহ হয়। মৃত্যুকালে বিধবা মা রূপা দেবী, স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী, এবং দুই শিশুকন্যা পার্বতী ও বাসন্তীকে রেখে যান। গুর্মুখের মৃত্যুর পর তাঁদের বিশাল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিকট আত্মীয়ের এক পুত্রকে লক্ষ্মী দেবী দত্তক নেন। এই পুত্রের নাম কানাইয়ালাল মুসাদ্দি। কানাইয়ালাল উত্তরকালে 'রায় বাহাদুর' খেতাব লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, গুর্মুখের মৃত্যু ও বিনোদিনীর মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ ঐ একই বছরে।

বিনোদিনীর জীবনটি বড় বিচিত্র। শৈশবে দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। কৈশোর থেকে যৌবন তাঁর কেটেছে অভিনেত্রীরূপে। শুধু অর্থ আর খ্যাতি নয়, সেই সঙ্গে তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও মনীষিগণের সান্নিধ্য। সর্বোপরি তাঁর শিরে বর্ষিত হয়েছিল ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্বাদ। জীবনে এমন সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়।

একদা রঙ্গমঞ্চের যিনি ছিলেন শিরোনাম, তিনি জন্মের মত আশ্রয় নিলেন গৃহাভ্যন্তরে। সুদীর্ঘ একত্রিশ বৎসর গার্হস্থ্য জীবন কাটিয়েছেন কিন্তু সেই জীবনও শেষ পর্যন্ত তাঁর সুখের হয়নি। পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে বৈধব্য বেশে, থান কাপড় পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, আবার ফিরে এসেছিলেন ১৪৫নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে তাঁদের সেই

পূর্বতন ভিটায়। এর পর জীবনের শেষ ২৩ বৎসর তিনি কাটিয়েছেন একান্ত নিঃসঙ্গভাবে। ভগবৎ চিন্তা আর সাহিত্যসেবায় তাঁর শেষ দিনগুলি কেটেছে। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে রঙ্গনটী বিনোদিনী গৈরিকবসনা সন্ন্যাসিনীর বেশে গোপালের সেবায় দিন কাটিয়েছেন। শেষে রঙ্গজগতের মানুষদের অগোচরে ১৯৪১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। অভিনেত্রী জীবনে যাঁকে নিয়ে এত আলোড়ন-বিলোড়ন, সংবাদপত্রে যাঁর অভিনয়ের সমালোচনা দিনের পর দিন প্রকাশিত হয়েছে, যাঁর অজস্র ছবি ছাপা হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, সেই সময়কার বড় বড় ইংরেজী সংবাদপত্রে যাঁকে **'Flower of the native stage'** বলে অভিহিত করা হত, অথচ মৃত্যুর পরে তাঁর কোন শোক-সংবাদও প্রকাশিত হয়নি। তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিনোদিনীকে বলেছিলেন, "বল মা, হরি গুরু, গুরু হরি"। শেষ জীবনে রামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই বাণীকে বিনোদিনী বীজ মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। অভিনেত্রী জীবনে বিনোদিনী যেমন বহু বিচিত্র চরিত্রে অভিনয় করে গেছেন, তেমনি তাঁর জীবন-নাট্যও বড় কম বিচিত্র নয়।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তাঁর অভিনেত্রী জীবনের সূচনা হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাধীনে। ১৮৭৭ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ-দানের পর, তাঁর অভিনয়-প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। 'মেঘনাদ বধ', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'বিষবৃক্ষ', 'রাবণ বধ', 'অভিমন্যু বধ', 'সীতার বনবাস', 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'নল দময়ন্তী', 'চৈতন্য-লীলা', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'বুদ্ধদেব-চরিত', 'বিল্বমঙ্গল', 'বেল্লিক বাজার' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে তিনি অসামান্যা অভিনেত্রীরূপে সকলের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। শুধু এ দেশের সাহিত্যিক ও দেশবরেণ্য মনীষীদের যে অজস্র প্রশংসা ও স্নেহ লাভ তিনি করেছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে বিদেশী গুণী ব্যক্তিরাও তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

মহিলা লেখিকাদের মধ্যে বিনোদিনীই বোধ হয় দ্বিতীয় মহিলা যিনি বাংলা ভাষায় আত্মচরিত রচনা করে গেছেন। তাঁর 'আমার জীবন' নামে আত্মচরিতে তিনি তাঁর অভিনেত্রী জীবনের যে সকল ঘটনা বিবৃত করে গেছেন, তাকে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের একটি তথ্যপূর্ণ দলিল বলা চলে। বিনোদিনী আত্মজীবনীতে এমন সব ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন, যা নাটক, নাট্যশালা সম্পর্কে গবেষকদের কাছে বর্তমানে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যরূপে গৃহীত হচ্ছে। এদিক থেকে বিচার করলে বিনোদিনীর আত্মচরিত কেবলমাত্র আত্মচরিতই নয়, নাট্যশালার আদি-পর্বের ইতিহাসও বটে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, যিনি মাত্র দশ-এগার বৎসর বয়সে নাট্যশালায় অভিনয় করতে এসেছিলেন, তাঁর এমন সাহিত্যবোধ, এমন ভাষাজ্ঞান জন্মাল কি করে? নাট্যকারের ভাষা আয়ত্ত করতে কবতেই যে তাঁর ভাষাজ্ঞান হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তিনি যে শুধু আত্মচরিতই রচনা করে গেছেন তা নয়, সেই সঙ্গে 'কনক ও নলিনী' এবং 'বাসনা' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থও রচনা করে গেছেন। কোথাও ত্রিপদী, কোথাও পয়ার, কোথাও লঘু ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে ভাষা ও ভাবের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি প্রকৃত কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন।

বিনোদিনী শুধু নটী নন। বহুবিচিত্র জীবনের অধিকারিণী। বিনোদিনী কবি, বিনোদিনী গৃহিণী, বিনোদিনী সন্ন্যাসিনী।

বিদ্রোহী নায়ক উপেন দাস

বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে উপেন্দ্রনাথ দাসের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। উপেন্দ্রনাথের চরিত্র যেমন বহু দোষ-দুষ্ট কাঁটায় ভর্তি ছিল, অন্যদিকে তেমনি তাঁর স্বদেশচেতনা, সমাজ-সংস্কারের অদম্য বাসনা এবং সর্বোপরি তাঁর দুর্জয় সাহস ও মনোবল সর্বকালের যুব সমাজের কাছে আদর্শস্থানীয় হয়ে আছে।

উপেন্দ্রনাথের জন্ম বাংলা ১২৫৫ সালে। উপেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীনাথ দাস একসময়ে সংস্কৃত কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। পরে ওকালতি পাস করে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করে প্রচুর বিত্ত-সম্পদের অধিকারী হন। বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন শ্রীনাথ দাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু। শ্রীনাথ দাসের নয়টি পুত্রের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ ছিলেন মধ্যম পুত্র। উপেন্দ্রনাথের অগ্রজ মহেন্দ্রনাথ অকালে পরলোকগমন করেন। উপেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর পিতা শ্রীনাথ দাস ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল মানুষ। তিনি সমুদ্রযাত্রায় আপত্তি করেন। পিতার এই রক্ষণশীল মনোভাবের প্রতি উপেন্দ্রনাথ বরাবরই বিরূপ ছিলেন। সে যুগের রীতি অনুসারে ছাত্রাবস্থায় উপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বিলাত যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে যে সময় পিতার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের মনোমালিন্য চলছিল, ঠিক সেই সময়ে উপেন্দ্রনাথের স্ত্রী মনোমোহিনী কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। উপেন্দ্রনাথ চিকিৎসার জন্য স্ত্রীকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করতে চান। কিন্তু পিতা শ্রীনাথ দাস আপত্তি প্রকাশ করেন। পুত্রবধূকে হাসপাতালে না দিয়ে তদানীন্তন কালের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের গৃহে এনে, তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মনোমোহিনীকে বাঁচান সম্ভব হয় না। এই ঘটনার পর পিতার

রক্ষণশীল মনোভাবের প্রতিবাদে উপেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রজীবনে উপেন্দ্রনাথ অপেক্ষা এক বছরের জুনিয়র ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। উপেন্দ্রনাথ ও শিবনাথের মন এই সময় রক্ষণশীল সমাজের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ধর্মের নামে ব্যভিচার ও রক্ষণশীল সমাজের প্রতি তাঁরা জেহাদ ঘোষণা করেন। এবং **Indian Radical League** নামে এক সংগঠন গড়ে তোলেন। শিবনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ষণশীল ধর্ম, সমাজ এবং ইংরেজ সরকারের অন্যায় কাজের প্রতি বিরূপ সমালোচনা করে বক্তৃতা দিতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বক্তৃতার আসরে আশানুরূপ জনসমাগম হয় না। শিবনাথ ও উপেন্দ্রনাথ উভয়েই তখন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। গৃহ-সংসার হারা। আত্মীয়পরিজন কর্তৃক পরিত্যক্ত। এই সময় উপেন্দ্রনাথ নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে **Indian Radical League**-এর উদ্দেশ্য সাধনের এক পরিকল্পনা করেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন উপেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। শিশিরকুমারের সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। শিশিরকুমারের মাধ্যমে উপেন্দ্রনাথ 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' অধিগ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালের ২রা জানুয়ারি উপেন্দ্রনাথের রচিত প্রথম নাটক 'শরৎ-সরোজিনী' 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' মঞ্চস্থ হয়। শরতের ভূমিকায় সে যুগের সর্বজনপ্রিয় নায়ক মহেন্দ্র বসু, সরোজিনীর ভূমিকায় রাজকুমারী, সুকুমারীর ভূমিকায় গোলাপসুন্দরী ও বৈজ্ঞানিকের চরিত্রে গোষ্ঠবিহারী দত্ত আত্মপ্রকাশ করেন। 'শরৎ-সরোজিনী' রঙ্গজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে ১৮৭৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লেখা হয়, "গত শনিবার এবং তাহার পূর্বেকার শনিবার রাত্রিতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। দুই দিন রঙ্গভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শরৎ-সরোজিনী নাটকের অভিনয়

দেখিবার নিমিত্ত নগরবাসীদিগের এইরূপ কৌতূহল ও ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল যে, শুনিতে পাওয়া যায় নাকি স্থানাভাব প্রযুক্ত চারি পাঁচ শত লোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।'

'শরৎ-সরোজিনী'র অসামান্য সাফল্যে উপেন্দ্রনাথ খুবই উৎসাহিত হন। গোলাপসুন্দরী সুকুমারীর চরিত্রে এমন প্রাণবন্ত অভিনয় করেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি সুকুমারী নামেই পরিচিতা হয়ে ওঠেন। এই সময় উপেন্দ্রনাথ নাট্য-রচনা ও প্রযোজনার জন্য যেমন প্রশংসিত হন, অন্যদিকে তেমনি বারনারী নিয়ে রঙ্গভূমির কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাঁকে অজস্র নিন্দা ও অপবাদ সইতে হয়। এই সময়ে উপেন্দ্রনাথের মনে হয়, অভিনেত্রীদের বিবাহ দিয়ে ভদ্রপল্লীতে যদি তাদের ঘর-সংসার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে বোধহয় নিন্দা অপবাদ কতকটা প্রশমিত হতে পারে। ১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের বৈজ্ঞানিকের চরিত্রের অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে গোলাপসুন্দরীর ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে বিবাহ দেন। এরপর গোলাপসুন্দরী মিসেস সুকুমারী দত্ত নামে পরিচিতা হয়ে ওঠেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে উপেন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়ে এই বিবাহের ব্যবস্থা করেন, তার ফল হয় উল্টো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। কিন্তু দৃঢ়চেতা উপেন্দ্রনাথ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে, পরবর্তী নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ১৮৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। এই সময় উপেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনালের ডিরেক্টর হন এবং অমৃতলাল বসু ম্যানেজার রূপে যোগদান করেন। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকটি বাংলার নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। উপেন্দ্রনাথ এই নাটকে বিরাজমোহিনী নামে জনৈকা বিধবা মহিলার ওপর এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচারের কাহিনী চিত্রিত করেন। ইংরেজ সরকার এই নাটকের অভিনয়ে ক্ষুব্ধ হন। এবং নাটকটি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে অভিযোগ আনয়ন করেন।

১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রিন্স অব ওয়েলস্ (সপ্তম এডোয়ার্ড) ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি কলকাতায় এলে ভবানীপুর বকুলবাগানের রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর (তদানীন্তন কলিকাতা হাই-কোর্টের সরকারী উকিল) তাঁর গৃহে প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে আমন্ত্রণ জানান।

প্রিন্স অব ওয়েলস্ তাঁর গৃহে গেলে, মুখোপাধ্যায় পরিবারের মেয়েরা হিন্দু আচারে তাঁকে বরণ করেন। পুরাঙ্গনাদের দিয়ে যুবরাজকে বরণ করানোর ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তথা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা বিরূপ সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজিমাৎ' নামক এক সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় তীব্র প্রতিবাদ করে লেখা হয়—"The Hindu Society can bear all oppression, but no shock to its womanhood Any person, who allows the family to be defiled from outside, is a disgrace, nay a great enemy, to Hindu…"

এইভাবে যখন চতুর্দিকে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে চলেছে, উপেন্দ্রনাথ তখন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি 'গজদানন্দ' নামে ব্যঙ্গ নাট্য-রচনা করলেন। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচারের দৃশ্য বর্ণিত হওয়াতে, এবং তার পূর্বে 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ সংলাপ থাকায় উপেন্দ্রনাথের থিয়েটারের প্রতি ইংরেজ সরকারের যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ ছিল। তার ওপর 'গজদানন্দ' মঞ্চস্থ হওয়ায় ইংরেজ সরকার ১৮৭৬ সালের ৪ঠা মার্চ, অভিনয় চলাকালীন সরাসরি মঞ্চের ওপর হামলা চালিয়ে উপেন দাস, অমৃতলাল বসু প্রমুখ আটজন শিল্পীকে গ্রেপ্তার করে। নিম্ন আদালতের বিচারে উপেন দাস ও অমৃতলালের একমাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অপর ছয়জন মুক্তিলাভ

করেন। হাইকোর্টে আপীলে উপেন দাস ও অমৃতলাল মুক্তিলাভ করেন। এরপর ইংরেজ সরকার ১৮৭৬ সালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেন। যে আইন ইংরেজ শাসনে সুদীর্ঘকাল বলবৎ ছিল এবং স্বাধীনতালাভের পরেও কয়েক বৎসর সে আইন যথারীতি বজায় ছিল। পরে নাট্যকর্মীদের আন্দোলনের ফলে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন অপসারিত হয়।

শিবনাথের সহায়তায় উপেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার এক উগ্র ক্ষত্রিয়ের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। জীবন-সংগ্রামে উপেন্দ্রনাথের দেহমন ভেঙে পড়ে এবং কঠিন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হয় যে, রোগের চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করাও দুরূহ হয়ে ওঠে। শেষে অনন্যোপায় হয়ে শিবনাথ বিদ্যাসাগর মশাই-এর শরণাপন্ন হন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মশাইয়ের চেষ্টায় পিতাপুত্রের মিলন সম্ভব হয়। শ্রীনাথ দাস পুত্রকে বাড়িতে নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সুদীর্ঘকালের চিকিৎসায় পুত্রকে সুস্থ করে তোলেন। যে পুত্রকে একদা তিনি বিলাতে পাঠাতে প্রবল আপত্তি করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকেই তিনি বিলাতে পাঠিয়ে দেন। বিলাতে গিয়েও তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করায় কিছুকালের জন্য কারাবরণ করেন। সুদীর্ঘ ১১ বছরকাল তিনি বিলাতে ছিলেন। ১৮৮৮ সালে স্বদেশে ফিরে এসে পুনরায় রঙ্গমঞ্চের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ৩৮, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বীণা থিয়েটার, নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের কাছ থেকে লীজ নিয়ে নিউ ন্যাশনাল নামে থিয়েটার করেন। ইংরাজী নাটকের ভাবালম্বনে 'দাদা ও আমি' নামে নাটক রচনা করে ১৮৮৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর, উক্ত থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন। ইতিপূর্বে নাট্যকার ও পরিচালকরূপে উপেন্দ্রনাথ মঞ্চের সেবা করে এসেছেন। 'দাদা ও আমি' নাটকে এবার নাটকের মূল চরিত্র ধীরেন অর্থাৎ দাদার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার বেশিদিন তাঁর পক্ষে চালানো সম্ভব হয়নি। পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৩০২

সালের ২২শে শ্রাবণ, মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে উপেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন। শ্রীনাথ দাসের জীবদ্দশায় তাঁর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া পত্নী সৌরভিনীও তাঁর মৃত্যুর পূর্বে পরলোকগমন করেন। উপেন্দ্রনাথের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথের পৌত্র চিত্র-পরিচালক ও অভিনেতা সুখেন দাস তাঁর জ্যেষ্ঠ পিতামহ উপেন্দ্রনাথের অভিনয় কলাশিল্পের ঐতিহ্য আজও বহন করে চলেছেন।

উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক বছর পর, তাঁর জনৈক বন্ধু ১৩০৭ সালের 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায় 'বন্ধুকৃত্য' নামক এক প্রবন্ধে লেখেন—'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ও 'শরৎ-সরোজিনী' প্রণেতা বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় স্থান অধিকার করেন নাই। উপেন্দ্রনাথ দাস সমাজে বা নিজগৃহে যাহাই হোন না কেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভীষ্ম-দ্রোণ না হউন, অন্য একজন মহারথী স্থানীয় বটে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় যেটুকু মন্দ আছে, উপেন্দ্রনাথ তাহা পুরাপুরি পাইয়াছিলেন। সভ্যতার উজ্জ্বল আবরণের ভিতর এমন একটা অন্ধকারময় অংশ ছিল, যাহা বাহির করিবার একেবারেই যোগ্য নহে। উপেন্দ্রনাথের প্রতিভা স্ফুরিত হইতে পায় নাই। যে প্রতিভায় 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' রচিত হইয়াছিল, শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিভা তাঁহার সমান ছিল। চিত্তের অব্যবস্থিততা উপেন্দ্রনাথের পতনের একটি কারণ। আজ খবরের কাগজ, কাল থিয়েটার লইয়া সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সবুর কথাটা তাঁহার অভিধানে ছিল না…"

ট্র্যাজেডিয়ান মহেন্দ্রলাল বসু

নাট্যশালার গোড়ার যুগের সর্বজনপ্রিয় হিরো বা নায়ক মহেন্দ্রলাল বসু। প্রথম জীবনে বাগবাজার এ্যামেচার ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হলে, তার উষালগ্ন থেকেই অভিনয়-শিল্পীরূপে যুক্ত হন। করুণ রসাত্মক অভিনয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাই ট্র্যাজিডিয়ানরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

মহেন্দ্রলালের জন্ম বাং ১২ই কার্তিক, ১২৬০ (ইং ১৮৫৩, ২৮শে অক্টোবর)। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' গিরিশচন্দ্রের পরিচালনায় শ্যামবাজারে রাজেন্দ্র পালের বাড়িতে অভিনীত হয়। মহেন্দ্রলাল 'লীলাবতী' নাটকে ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার বছর। সে সময়ে বাগবাজারের এই নাট্যসংস্থা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ১৮৭১ সালের মে মাসে 'লীলাবতী'ই এই অবৈতনিক সম্প্রদায়ের শেষ অভিনয়। অর্ধেন্দুশেখর তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন—"এর দেড় বৎসর পরে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়।" ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর, সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্ধেন্দুশেখর দেড় বছরের কথা উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে দেড় বছরের কিছু অধিককাল পরেই 'নীলদর্পণ' অভিনীত

যাই হোক, ন্যাশনাল থিয়েটার ব্যবসায়িক থিয়েটারে পরিণত হলে, মহেন্দ্রলাল সেখানে নিয়মিত অভিনয় করতে থাকেন। অবৈতনিক থিয়েটারে তিনি পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করলেও, ব্যবসায়ী থিয়েটারের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণে' তিনি পদী ময়রানী ও সাধুচরণ, পুরুষ ও স্ত্রী উভয় চরিত্রেই আত্মপ্রকাশ করেন। অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথার এক জায়গায় লিখেছেন—"...অনন্যসাধারণ রূপগুণসম্পন্ন

মহেন্দ্র বসু পদ্মী ময়রানীর ভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।”

ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘নীলদর্পণ’ অভিনয়ের পর, ১৮৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ‘জামাই বারিক’, ২৮শে ডিসেম্বর ‘সধবার একাদশী’, ১৮৭৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ‘নবীন তপস্বিনী’, ১১ই জানুয়ারি ‘লীলাবতী’, ১৫ই জানুয়ারি ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ প্রভৃতি দীনবন্ধুর নাটকগুলি একের পর এক অভিনীত হয়। মহেন্দ্রলাল উল্লিখিত নাটকগুলিতে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন।

এই সময় হিন্দুমেলায় অভিনয় করার জন্য ন্যাশনাল থিয়েটার আহূত হয়। ‘ভারত রাজলক্ষ্মী’ ও মাইকেল মধুসূদনের ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত হয়। মহেন্দ্রলাল ‘ভারত রাজলক্ষ্মী”তে ভারতমাতা এবং ‘কৃষ্ণকুমারী’তে অহল্যার ভূমিকায় অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্র ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে ভীম সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন। বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে অভিনয়ে অংশ-গ্রহণ করলেও গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞাপনে নিজের নাম প্রচারিত হতে দেননি। একজন বিশিষ্ট অবৈতনিক (এ্যামেচার) শিল্পীরূপে তিনি আত্ম প্রকাশ করেন।

‘কৃষ্ণকুমারী’ অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারে ভাঙন ধরে। ন্যাশনাল থিয়েটার দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদলে অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, অপর দলে গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল শূর প্রভৃতি। এই দুটি দল—দুটি পৃথক নাট্যদল গঠন করেন। গিরিশচন্দ্রের দল ন্যাশনাল নাম ধারণ করে। অর্ধেন্দুশেখরের দল হিন্দু ন্যাশনাল নামে অভিনয় করতে থাকে।

মহেন্দ্রলালের পিতা ব্রজেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন গিরিশচন্দ্রের বন্ধু। মহেন্দ্রলাল পিতৃবন্ধুর দলে যোগদান করে গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলা’য় নবকুমারের ভূমিকায় সর্বপ্রথম নায়করূপে

মঞ্চাবতরণ করেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের এই অভিনয় হয় শোভা-বাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে, ১৮৭৩ সালের ১০ই মে। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় মহেন্দ্রলাল নবকুমারের ভূমিকায় প্রশংসালাভ করেন।

এরপর ১৮৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, ৬নং বিডন স্ট্রীটে ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ১৮৭৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি, গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপায়িত ও পরিচালিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' অভিনীত হয়। বক্তিয়ার খিলজীর ভূমিকায় অভিনয় করে মহেন্দ্রলাল খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের 'পুরু বিক্রম' নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করেন। ক্রমশঃ তাঁর অভিনয়-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সময় মহেন্দ্রলাল নাট্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৭৫ সালের ৩রা জুলাই, তাঁর রচিত 'পদ্মিনী' নাটক অভিনীত হয়। মহেন্দ্রলাল তাঁর নিজের নাটকে ভীম সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

ভুবনমোহনের থিয়েটার এই সময়ে আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং শ্যামপুকুরের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লীজ দেওয়া হয়। মহেন্দ্র-লাল কৃষ্ণধনবাবুর থিয়েটারের ম্যানেজার ও নাট্য-শিক্ষক নিযুক্ত হন।

নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভুবন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নীলামে ওঠে। থিয়েটারটি প্রতাপ জহুরী কিনে নেন। গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্বে প্রতাপ জহুরী ১৮৮১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে 'ন্যাশনাল' নামে থিয়েটারটি চালাতে থাকেন। মহেন্দ্র-লাল ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানে প্রতি নাটকের অভিনয়ে তিনি অনন্যসাধারণ অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর 'রাবণ বধ' নাটকে লক্ষ্মণের ভূমিকায় অভিনয় প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন—"রাবণ বধের লক্ষ্মণ, সীতার কথার উত্তরে 'জ্যেষ্ঠ অনুগামী তাতঃ' এবং স্বগত 'কেন মাগো, সুমিত্রা জননী ধরেছিলে গর্ভে মোরে'! গভীর শোকাচ্ছন্ন ধীর কণ্ঠে প্রস্তরবৎ অচলভাবে যেরূপ উচ্চারিত

হইয়াছিল তাহা শ্রবণে দর্শকবৃন্দ প্রস্তরবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমি রাম সাজিয়াছিলাম, আমার চক্ষে জল আসিল।"

প্রতাপচাঁদের থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের শেষ নাটক 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। এই নাটকে মহেন্দ্রলাল 'বৃহন্নলা'র ভূমিকায় রূপদান করেন। গিরিশচন্দ্র সদলবলে প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলে, মহেন্দ্রলাল রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। পরে এমারেল্ড, ক্লাসিক প্রভৃতি থিয়েটারেও অভিনয় করেন। তখন তিনি রঙ্গমঞ্চের একচ্ছত্র নায়ক। ১৮৯০ সালের ৭ই জুন এমারেল্ড থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' প্রথম অভিনীত হয়। কুমার সেনের ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল প্রাণবন্ত অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' গ্রন্থের প্রথম পর্বে মহেন্দ্রলালের কুমার সেনের অভিনয় প্রসঙ্গে লিখেছেন—'রাজা ও রাণী' সর্বপ্রথম অভিনীত হয়েছিল গোপাললাল শীলের এমারেল্ডে। কুমার সেন এমারেল্ডে করতেন মহেন্দ্রলাল বসু—মহেন্দ্র মাস্টার ছিল যাঁর নাম। অমৃতলাল মিত্রের জুড়ি ছিলেন ইনি, কৃতী গিরিশ-শিষ্য। এঁকে বলা হত 'ট্র্যাজেডিয়ান অব বেঙ্গল'। অতি সুন্দর ছিল গলা। অমৃতবাবুর গলাও ছিল সুন্দর, কিন্তু একটু সুরেলা। মহেন্দ্রবাবুর গলা একটু গম্ভীর, সুর বর্জিত, মানিয়ে যেত অদ্ভুতভাবে। তাঁর 'ইলা—ইলা ফিরে গেনু দুয়ারে আসিয়া।' যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা বলতেন আজও যেন কানে বাজে।'

১৮৯৩ সালে ২৬শে জুন এমারেল্ডে 'সধবার একাদশী' অভিনীত হয়। ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদের ভূমিকায় অবিস্মরণীয় রূপদান করেন। সে অভিনয় অমৃতলালের কাব্যে ধরা পড়ে আছে—

'মদে মত্ত পদতলে
নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ।
নব নটগুরু তার।'

কিন্তু এমারেল্ডে নিমচাঁদের ভূমিকায় মহেন্দ্রলালও কম কৃতিত্ব দেখাননি। তাঁর অভিনয় সম্পর্কে ১৮৯৩ সালের ৩০শে জুলাই 'অনুসন্ধান' পত্রিকা সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখে—"…নিমচাঁদ এ প্রহসনের জান। সেই পুরাতন পাকা অভিনেতা মহেন্দ্রবাবু স্বয়ং এই নিমচাঁদের অংশে অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র-বাবু নিমচাঁদের জীবন্ত ছবি দর্শকমণ্ডলীর চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। নিমচাঁদের অভিনয়ে এরূপ দক্ষতা আমরা এ পর্যন্ত অতি অল্পই দেখিয়াছি।"

নটনাথের একনিষ্ঠ সেবক মহেন্দ্রলালের শেষ অভিনয় ক্লাসিক থিয়েটারে 'সীতারাম' নাটকে গঙ্গাদাসের ভূমিকায়।

মহেন্দ্রলাল বাং ১৩০৭ সালের ২৪শে ফাল্গুন (ইং ১৯০১, ৮ই মার্চ) মাত্র ৪৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর, গিরিশচন্দ্র তাঁর 'পঞ্চনায়ক' প্রবন্ধে মহেন্দ্রলাল সম্পর্কে লিখেছেন—"প্রতি ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল সুদক্ষ অভিনেতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।…এক কথায় পাঠককে বুঝাই যে, অদ্যাবধি সকল ভূমিকাই তাঁহার অনুকরণেই চলিতেছে। কেহই তাঁহার কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া অভিনয় করিতে সক্ষম হন নাই। মহেন্দ্রলাল যে কেবল অভিনয় কার্যে দক্ষ ছিলেন, তাহা নয়, তাঁহার পরামর্শে অনেক রঙ্গমঞ্চ অনেক সময় সুন্দর চিত্রপটে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

মহেন্দ্রলাল মুক্ত-হস্ত পুরুষ ছিলেন। পর-দুঃখ মোচনে ও সুহৃদ সেবায় তিনি তাঁহার অনেক সম্পত্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। বিদ্যাদানে কখনও কাতর হইতেন না। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গ রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবার নহে; অপর মহেন্দ্রলালের জন্মগ্রহণ সময় সাপেক্ষ।…"

নট-নাট্যকার, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়

বাংলা নাটক রচনা ও রঙ্গালয় পরিচালনাব ক্ষেত্রে কবি, নট ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের ভূমিকা অনন্যসাধাবণ। রাজকৃষ্ণ রায়ের জন্ম ১৮৪৯ সালের ২১শে অক্টোবর, রবিবার। বর্ধমান জেলার মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামে এক তিলি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মগ্রহণের ১১ মাস পরেই তিনি মাতৃহারা হন। তাঁর পিতা কলকাতায় ব্যবসা করতেন। রাজকৃষ্ণের মাতৃবিয়োগের পর, তিনি শিশু-পুত্রকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। তাঁর পিতার বাসায় এক স্বজাতীয়া রমণী ছিলেন। শিশু রাজকৃষ্ণকে তিনিই লালন-পালন করেন। রাজকৃষ্ণ তাকে মাসী বলতেন। রাজকৃষ্ণের দীর্ঘকালের বন্ধু শরচ্চন্দ্র দেব ১৯১৫ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত ও রাজকৃষ্ণ রায় রচিত বিশুদ্ধ বাংলা পদ্য ছন্দে অনুবাদিত 'বাল্মিকী রামায়ণে' যে জীবনী রচনা করেছেন, তার এক জায়গায় লিখেছেন— "...এই রমণীকে তিনি মাসী বলিতেন, পরে জানিতে পারেন যে, তিনি তাঁহার পিতার সেবিকা মাত্র। যাহা হউক এই রমণীর সযত্ন পালনেই রাজকৃষ্ণ বাবু বর্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পরও যত দিন তিনি জীবিতা ছিলেন তত দিন তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং উত্তরকালে তাহার ভ্রাতাকেও অর্থ সাহায্য করিতে দেখিয়াছি।"

রাজকৃষ্ণের শিক্ষা শুরু হয় ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে। এরই মধ্যে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পরেও কায়ক্লেশে আরো কিছু-দিন তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু পর পর কয়েকবার রোগা-ক্রান্ত হওয়ায়, তাঁকে পড়াশোনায় ইস্তফা দিতে হয়। কিন্তু কৈশোর-কাল থেকেই তাঁর কাব্যানুরাগ প্রকাশ পায়। 'প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা পড়ে তিনি উৎসাহিত হয়ে কাব্যরচনা করতে শুরু করেন। এই কিশোর বয়সে লেখা তাঁর কবিতা 'এডুকেশন গেজেট',

'প্রভাকর' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁর প্রথম বয়সের আরো অনেক রচনা সে যুগের 'আর্য্যদর্শন' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১, আশ্বিন ১২৮৩) 'বঙ্গমহিলা' (মাঘ ১২৮২), 'তমোলুক পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক, ১২৮২, কবিতা এবং গদ্য রচনা), 'জ্ঞানাঙ্কুর' (ভাদ্র ১২৮২) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচনাশক্তি ছিল ঈশ্বরদত্ত।

জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর তাঁর জীবনস্মৃতিতে (পৃঃ ১৬০-৬১) রাজকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা বিবৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন— "রাজকৃষ্ণবাবু যখন 'বিদ্বজ্জন সমাগমে' (জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে) আসিতেন, তখন তিনি উদীয়মান কবি। সবেমাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্বে একবার আমি, গুণুদাদা, আমার ভগ্নীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজাব সময় পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। মধ্যে কি একটা স্টেশনে রোগা, পরণে ময়লা কাপড়, খালি পা, একটি ছোক্‌রা আসিয়া আমাদিগকে বলিল—'আমি মামার বাড়ী যাইব, হাতে পয়সা নাই। যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন তো বড় উপকৃত হই।' যদুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় ভালবাসিতেন, রহস্য করিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার?' বালক অমনি সপ্রতিভ ভাবে মৃদুস্বরে বলিল, 'হাঁ পারি।' আমরা ভাবিলাম—লোকটা পাগল নাকি? যদু অধিকতর কৌতূহলী হইয়া রহস্যচ্ছলে আবার বলিলেন, 'তা বাঃ, বেশ বেশ! দেখ, এই কেদার আমায় আমার প্রেয়সী 'তারা'র নিকট হইতে, ছিনাইয়া লইয়া চলিয়াছে! বল ত বাপু এমনি করিয়া কি ভদ্রলোককে দুঃখ দিতে হয়? তুমি এই বিষয়ে একটি কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি। বালক তৎক্ষণাৎ একটি চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফস্ ফস্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার দুই ছত্র এখনও আমার মনে আছে :—

কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা ক'রে আনিয়া হেথায়। ইত্যাদি

আমরা জানিতাম না, এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজ-কৃষ্ণ রায। আজ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি, তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু।"

সে যুগে তিনি অসংখ্য কবিতা রচনা করে 'কবিবর রাজকৃষ্ণ' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে বহু নাটক যেমন রচনা করেছেন, তেমনি অসংখ্য কবিতা এবং গান রচনা করেছেন। তাঁব কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'অবসর-সরোজিনী' (চার খণ্ডে সমাপ্ত) কাব্যসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রাজকৃষ্ণ কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, এমন কি ছোটদের জন্যও কবিতা রচনা করে গেছেন। সর্বোপরি নট, নাট্যকার ও নাট্যগৃহ-পরিচালকরূপে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজকৃষ্ণই বোধহয় সর্বপ্রথম বঙ্গবাণীর সেবকরূপে সাহিত্য-রচনার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। তাঁর অদৃষ্ট, তাঁকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। বাণীর কৃপালাভ তিনি করলেও, লক্ষ্মীর কৃপালাভ তিনি কোনদিনই করতে পারেননি। মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি চরম দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করে গেছেন।

অভিনয়-কলার প্রতি তাঁর বরাবরই অনুরাগ ছিল। তাছাড়া যন্ত্র-শিল্পীরূপে সেতার বাজানোতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। পাণ্ডুয়ার সন্নিকটস্থ সবাই গ্রামে তাঁর উৎসাহে ও যত্নে এক শৌখিন অভিনয়ের দল গঠিত হয়। এই দলে তিনি কয়েকটি নাটক রচনা করে অভিনয় করেন। এ ছাড়া কলকাতায় ও মাহেশেও তিনি শৌখিন সম্প্রদায়ের দলভুক্ত হয়ে অভিনয় করেন। এক সময়ে কলকাতার আর্য-নাট্য-সমাজে তাঁর

'প্রহ্লাদ-চরিত্র' অভিনীত হয়। রাজকৃষ্ণ হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় রূপদান করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। এই খ্যাতি উত্তরকালে তাঁর জীবনকে অন্য খাতে প্রবাহিত করে।

প্রথম জীবনে কৃষ্ণগোপাল ভক্তের ছাপাখানা, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র ও আলবার্ট প্রেসের পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আলবার্ট প্রেস বিক্রয় হয়ে গেলে, তিনি নিজে ৩৭নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে বীণা যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এর আগে রাজকৃষ্ণবাবু 'সমাজ-দর্পণ' ও 'বীণা' নামে দুটি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সে যুগের বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে রামদাস সেন, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, মনোমোহন বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ 'বীণা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন।

রাজকৃষ্ণের প্রথম রচিত নাটক 'অনলে বিজলী' ১লা বৈশাখ ১২৮৫ (ইং ৭ই এপ্রিল, ১৮৭৮) সালে প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হওয়ার পর, বঙ্গরঙ্গভূমির কর্ণধারদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'লৌহ কারাগার' ১২৮৬ সালে (ইং ২৮শে জানুয়ারী ১৮৮০) প্রকাশিত হয়। তাঁব চতুর্থ নাটক 'হরধনুর্ভঙ্গ' ১২৮৮ সালে (ইং ২৮শে জুলাই ১৮৮২) প্রকাশিত হয়। নাটকটি প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে এবং পরে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' নাটকও ঐ একই সময়ে প্রকাশিত হয়। দু'টি নাটকই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে রাজকৃষ্ণ উক্ত নাটকের ভূমিকার এক জায়গায় লিখেছেন—"দুই তিনজন সুদক্ষ অভিনেতার অনুরোধে পাঁচ ছয়দিনের মধ্যে এই 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানি লিখিত হইল। তাঁহাদের অনুরোধ, নাটকখানি গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইলে ভাল হয়। অথচ পাঁচ ছয়দিনের মধ্যে লিখিয়া দেওয়াও চাই। সুতরাং, এত অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত ছন্দে লিখিয়া শেষ করা যে কি পর্যন্ত দুর্ঘট, তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্য আমি

অধিকাংশ স্থলে 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের' দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।"

গিরিশচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণের একই বৎসরে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাট্য-রচনা করা সম্পর্কে 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালায়' এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"রাজকৃষ্ণ রায় বাংলা কাব্যে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তক হইলেও বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই সম্মান গিরিশচন্দ্রেরই প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' আভিনয়িক ছন্দে রচিত হইয়া একই বৎসরে—১২৮৮ সালে প্রকাশিত ও কয়েকদিনের ব্যবধানে অভিনীত হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয় নাট্যকারই পরস্পরেব অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ রচনায় স্বাধীনভাবে এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন মনে করাই সঙ্গত হইবে। তবে এই ছন্দ গিরিশচন্দ্রের হস্তে যেরূপ সার্থক ও সুন্দর হইতে পারিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না।"

রাজকৃষ্ণ নাটকে যেমন 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর' ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনি তাঁর রচিত কাব্যেও তিনি নানা ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে ছন্দের ব্যবহারে তিনি তাঁর কাব্যের ভাবসম্পদকে পাঠকের কাছে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, সে যুগে গদ্য কবিতা রচনা করেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইং ১৮৮৪ সালে জুলাই মাসে, বাং ১২৯১ শ্রাবণ সংখ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্যদর্শনে' 'বর্ষায় মেঘ' নামে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির প্রথম তিন লাইন এই রকম :—

'আকাশ নীল—অনন্তনীল,
মানব চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল।' ইত্যাদি

কবিতাটির পাদটীকায় রাজকৃষ্ণ লেখেন—"যে সকল গদ্যে পদ্যের

কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গন্থের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ। লেখা তো হইল, এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।" ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে বর্তমানকালে যে গদ্য-কবিতার এত সমাদর, সেই কবিতা তিনি আজ থেকে একশো বছর আগে রচনা করেছেন।

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটক রাজকৃষ্ণকে যশোমণ্ডিত করেছিল। বেঙ্গল থিয়েটারে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' প্রথম অভিনীত হয় ১৮৮৪ সালের ১১ই অক্টোবর। আর স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' মঞ্চস্থ হয় ১৮৮৪ সালের ২২শে নভেম্বর। কিন্তু রাজকৃষ্ণের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। বলা যেতে পারে এই নাটক মঞ্চস্থ কবে, বেঙ্গল থিয়েটারও একযোগে লক্ষ্মী সরস্বতীর কৃপালাভ করেছিল।

বীণা প্রেস ও 'বীণা' পত্রিকা প্রকাশ করে, আর সেই সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য নাটক রচনা করে রাজকৃষ্ণবাবু কোনরকমে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে চলেছিলেন। কিন্তু রঙ্গালয়ের আকর্ষণে, তিনি একটি নিজস্ব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করলেন। 'বীণা' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। বীণা প্রেস বিক্রয় করলেন। প্রেসের বিক্রয়লব্ধ অর্থে ৩৮নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠা করলেন বীণা রঙ্গালয়। এই রঙ্গালয়ে তিনি পুরুষদের দ্বারাই স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়ের ব্যবস্থা করে, নিজেও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। অচিরে তিনি অভিনেতা-রূপেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেন। কিন্তু যে সঙ্কল্প নিয়ে তিনি এই রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে সঙ্কল্প থেকে তাঁকে বিচ্যুত হতে হলো। বীণা থিয়েটারকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। মাস ছয়েক কোন রকমে থিয়েটার চালিয়ে, দেনার দায়ে থিয়েটার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। এই প্রসঙ্গে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' পত্রিকার ১৮৮৮ সালের ৯ই নভেম্বর যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহার এক জায়গায় লেখা হয়— "...আজকাল সহরে বেশ্যা সংযুক্ত থিয়েটার সকলে পশার

ও প্রতিপত্তি যেরূপ তাহাতে কেবল পুরুষ অভিনেতা লইয়া স্থায়ী থিয়েটার স্থাপন করা অনেক সাহস ও বলের কার্য; তাহার পথে বিস্তর বিঘ্নবাধা।” ইত্যাদি। সত্যই সে সময়ে এ বাধা অতিক্রম করা রাজকৃষ্ণবাবুর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। রাজকৃষ্ণবাবুর সৃজনীশক্তি ছিল কিন্তু ব্যবসা বুদ্ধি ছিল না। আর তা ছিল না বলেই, রাজকৃষ্ণ-বাবুকে জীবনেব শেষদিন পর্যন্ত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল। শেষে স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র রজনীরঞ্জনকে নিয়ে সংসাবযাত্রা নির্বাহ করাও দুষ্কর হয়ে পড়ল। পাওনাদাবদের তাগাদায় আত্মসম্মান বজায় রাখাও কঠিন হয়ে উঠলো। এই দুঃসময়ে স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ১৮৯১ সালে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে তাঁকে নাট্যকাররূপে নিযুক্ত করেন। তাঁর রচিত ‘নরমেধ যজ্ঞ’ ‘লায়লা-মজনু’ ‘বনবীর’ ‘ঋষ্যশৃঙ্গ’ ‘বেনজিব-বদ্‌রেমুনির’ প্রভৃতি নাটক এই সময়ে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়।

বিপুল দেনার দায় মাথায় নিয়ে, মাত্র ১০০ টাকার ওপর নির্ভর করে, স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ করা যখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে জনৈক পাওনাদারের তাগাদায় তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। স্টার থিয়েটারে ‘নরমেধ যজ্ঞ’ নাটক তখন সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে। সেই সময় একদিন সকালে পাওনাদাবটি এসে, বহু অসম্মানজনক উক্তি করে গালাগালি দিলেন, আর সেই সঙ্গে বললেন—‘মশাইয়ের আঁচিলে-পাঁচিলে তো নামের ছড়াছড়ি, থিয়েটার তো বেশ ভালোভাবেই চলছে, অথচ দেনা মেটাবার নাম নেই। লজ্জা-সরমের বালাই নেই। তা যদি থাকতো, তাহলে একদিন চাবটে থিয়েটারের পাশ দিয়েও তো আমার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করতেন।’ কথা কটি বলে পাওনাদার চলে গেলেন। রাজকৃষ্ণ লজ্জায় মাথা তুলতে পারলেন না। নীরবে সব অপমান সহ্য করে, সজল নয়নে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় স্টার থিয়েটারের তদানীন্তন অন্যতম মালিক হরি বসুকে সব কথা জানিয়ে, চারটি পাশ নিয়ে, পাওনাদারকে দিয়ে এলেন,

আর এই সঙ্গে সবিনয়ে জানিয়ে এলেন, 'স্ত্রী-পুত্রের সম্মুখে অমন করে অপমান করবেন না। সত্যিই এখন আমি নিঃস্ব। আমার এমন কিছু নেই যা বিক্রি করে আমি দেনা শোধ করতে পারি। তবে বই-টই কিছু বিক্রি করে, আপনার দেনা শোধ করবো। বিশ্বাস করুন, আমি জালিয়াত বা জোচ্চোর নই। অবস্থা বিপাকে আজ আমার শ্রীবৎসের অবস্থা !'

যাই হোক, পাশের যথা নির্ধারিত দিনে পাওনাদারটি স্টার থিয়েটারে 'নরমেধ যজ্ঞ' নাটকের অভিনয় দেখতে এলেন। তখন সন্ধ্যা ৭টায় অভিনয় আরম্ভ হতো, আর শেষ হতো রাত্রি দেড়টা-দুটোয়। অঙ্কের শেষে অনেকক্ষণ ধরে ঐক্যতান বাদন চলতো। পাওনাদারের বাড়ি ছিল থিয়েটারের কাছেই। যে সব দর্শক থিয়েটারের কাছাকাছি থাকতেন, তাঁরা বিরতির মাঝে বাড়ি থেকে রাত্রির আহার সেরে আসতেন। পাওনাদারও বিরতির মাঝে বাড়ি গেলেন। ফিরে এসে আবার অভিনয় দেখতে লাগলেন। অভিনয় শেষ হলো। পাওনাদার থিয়েটারের দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজকৃষ্ণবাবু আছেন ?' পাওনাদারকে অপেক্ষা করতে বলে, দারোয়ান রাজকৃষ্ণবাবুর খোঁজে গেল। রাজকৃষ্ণবাবু পাওনাদারকে দেখেই করজোড়ে মিনতি করে বললেন—'দারোয়ান চাকরদের সামনে আর আমায় অপমান করবেন না।' উত্তরে পাওনাদার বললেন—'না, আর আপনাকে অপমান করবো-না। আমারই ভুল হয়েছে, যে মানুষ এমন নাটক লিখতে পারে, সে কখনো দেনা শোধ করতে পারে না। নাটক দেখেই আমার আসল ও সুদ শোধ হয়েছে। এই নিন আপনার হ্যাণ্ডনোট।' কথা কটি বলেই হ্যাণ্ডনোটটা ছিঁড়ে ফেলে পাওনাদার চলে গেলেন। রাজকৃষ্ণবাবু সজল নয়নে পাওনাদারের গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

এই মরমী, চিরদুঃখী কবি, নট ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় ১৮৯৪ সালের ১১ই মার্চ (বাং ২৮শে ফাল্গুন ১৩০০) মাত্র ৪৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

তাঁর মৃত্যুতে বাং ১৩০০ সালের ৩০শে ফাল্গুন, 'অনুসন্ধানে' লেখা হয়—"বঙ্গভাষা একটি রত্নহীন হইল—কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় আর নাই। গত ২৮শে ফাল্গুন, রবিবার, দ্বি-প্রহরের সময় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পুত্র পরিবারকে কাঁদাইয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।

অন্তরে যেন শেল বিঁধিয়াছে। এমন সুহৃদ, এমন অকপট বন্ধু, এমন হিতৈষী—এমনভাবে এত শীঘ্র আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ যে আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

তিনকড়ি দাসী

তিনকড়ি দাসী। রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের এক উজ্জ্বলতম তারকা। স্বকীয় মহিমায় আজও নাট্যানুরাগীদের কাছে স্মরণীয়া হয়ে আছেন।

তিনকড়ি জন্মগ্রহণ করেন বাং ১২৭৭ সালে কলকাতার এক কুখ্যাত পল্লীতে। তিনকড়ির মায়ের অবস্থা মন্দ ছিল না। কলকাতা শহরে নিজস্ব একটা বাড়ি ছিল। বাড়ি ভাড়ার আয়ে স্বচ্ছন্দে তাদের সংসার চলে যেত, কিন্তু তিনকড়ির মা ছিলেন একটু কৃপণস্বভাবা।

তিনকড়ির গানের গলাটা ছিল ভারি মিষ্টি। শৈশবে ভিখারীরা বাড়িতে গান গেয়ে ভিক্ষে করতে আসত। তাদের গান শুনে, কথা ও সুর অবিকল নিজের কণ্ঠে তুলে নিত তিনকড়ি। ছোট মেয়েটির এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা দেখে প্রতিবেশিনীরা অবাক হয়ে যেত। তিনকড়ির মাকে ডেকে বলত, ওস্তাদ রেখে গান শেখাও, কালে একজন বড় গাইয়ে হবে। কিন্তু তিনকড়ির মা, ওস্তাদের মাইনে যোগানোর ক্ষমতা নেই, এই অজুহাতে পাশ কাটিয়ে যেতেন। আর মনে মনে বলতেন, আর একটু বড় হোক। তেমনতর বাবু যদি জোটে তো তখন তার পয়সাতেই না হয় সে ব্যবস্থা করা যাবে।

১৮৭৭ সালের কথা। 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' তখন মহা-সমারোহে 'মেঘনাদবধ' নাটকের অভিনয় চলছিল। সারা কলকাতা শহর 'মেঘনাদবধ' নাটকের অভিনয়ের সুখ্যাতিতে মুখর। তিনকড়ির মা ও তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশিনী 'মেঘনাদবধে'র অভিনয় দেখতে যাওয়ার জন্যে ঠিক করলেন।

সেদিন শনিবার। দুপুরে ঘুম থেকে উঠে তিনকড়ি শুনল—তার মা ও তাঁর সঙ্গিনীরা 'মেঘনাদবধ' নাটকের অভিনয় দেখতে যাবেন। ছোট বয়েস থেকেই গান-বাজনা-যাত্রা প্রভৃতির ওপর তিনকড়ির খুব ঝোঁক। মা তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে থিয়েটার যাবেন শুনে, সেও বায়না

ধরল—থিয়েটার দেখতে যাবে বলে। মাও নিয়ে যাবেন না, মেয়েও ছাড়বে না। শেষে মেয়ে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে গেল। মার বকুনি ধম্‌কানিতেও মেয়ের কান্না থামে না। শেষে মায়ের বান্ধবীরা বললেন, চলুক বাপু, অত কাঁদছে যখন মেয়েটা, তখন না হয় ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে চল। বান্ধবীদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনকড়িকেও থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যেতে হয় তার মাকে।

তিনকড়ি তার মায়ের সঙ্গে সেজেগুজে এই প্রথম থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। কল্পনার কত রঙিন ছবিই না সেদিন তার চোখে ভেসে উঠেছিল। গিরিশচন্দ্র রামের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। অভিনয় দেখতে দেখতে কিশোরী তিনকড়ি একেবারে তন্ময় হয়ে গেল। বাড়িতে ফিরে এসে তার ঘুম এল না। শুধু থিয়েটারের কথাই সে ভাবতে লাগল। পরের দিন সকালে মাকে বলে বসল—'মা, আমি থিয়েটার করব।'

—থিয়েটার করবি ? কিন্তু থিয়েটারে ঢোকা যে ভীষণ শক্ত!

সেদিন থেকে থিয়েটারে ঢোকার নেশা তিনকড়িকে যেন পেয়ে বসল। প্রায় রোজই মাকে জ্বালাতন করতে লাগল থিয়েটারে ঢোকার জন্যে। এমনি করে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। তিনকড়ির বাসনা আর পূর্ণ হয় না।

আজকের চেয়েও সেদিন থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী হওয়া আরো শক্ত ছিল। সে সময় সুকুমারী, বিনোদিনী প্রভৃতি অভিনেত্রীদের খুব নাম। তিনকড়ি স্বপ্ন দেখে, ওঁদের মতো অভিনেত্রী হওয়ার। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনকড়ির মা থিয়েটারে ঢোকানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনকড়িদের বাড়ির কাছে এক ভদ্রলোক থাকতেন, তিনি তখন 'স্টার থিয়েটারে' অভিনয় করতেন। তিনকড়ির মা তাঁকে গিয়ে ধরলেন। তিনি ভরসা দিলেন না। তবে চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। এর বেশ কিছুদিন পরে, সেই প্রতিবেশী ভদ্রলোক একদিন তিনকড়িকে নিয়ে থিয়েটারে গেলেন। স্টার

থিয়েটারে তখন 'রূপসনাতন' নাটকের মহলা চলছিল। থিয়েটার কর্তৃপক্ষের চোখে লেগে গেল তিনকড়িকে। তার পরদিন থেকে নিয়মিত মহলায় আসার জন্যে বললেন। তিনকড়ি বাড়ি ফিরে এসে, তার মাকে সব কথা জানালো। থিয়েটারের বাবুরা তিনকড়িকে নেবে শুনে, তিনকড়ির মায়ের আর আনন্দ ধরে না। মেয়ের সকাল সকাল চুল বেঁধে দেওয়া, সাজগোজের ব্যবস্থা করা, মেয়ে কি খেয়ে থিয়েটারে যাবে ইত্যাদি নিয়ে তিনকড়ির মা পরের দিন থেকে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বাং ১২৯৪ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ গিরিশচন্দ্রের 'রূপসনাতন' নাটক মহাসমারোহে মঞ্চস্থ হল। তিনকড়ি এই নাটকে কোন ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পায়নি। এই সময় 'রূপসনাতন' ছাড়া মধ্যে মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয় হচ্ছিল। মাসখানেক পরে এই 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ এসে গেল তিনকড়ির। সেই ভূমিকাটি ছিল সম্পূর্ণ নির্বাক। রাধাকৃষ্ণের মিলনের দৃশ্যে, কৃষ্ণের সখী সেজে চামর ব্যজন করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না তিনকড়ির। যাই হোক, মঞ্চে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পেয়েই তিনকড়ি আনন্দে নেচে উঠলো।

এর কিছুদিন পরে রসরাজ অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটকে নির্বাক বাসরসঙ্গিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায় তিনকড়ি। 'রূপসনাতন' নাটকে কয়েকটি মেয়ে সখী সাজত, তাদের মধ্যে একটি মেয়ে হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ায়, তিনকড়ির সেদিন সখী সেজে গান গাওয়ার সুযোগ এসে গেল। তিনকড়ি গাইল—

'দেখ্‌লো ঐ রাইয়ের বেণী
কাল ভুজঙ্গিনী"—

সেদিন ঐ গানের সঙ্গে তিনকড়ির অঙ্গভঙ্গি এত চমৎকার হয়েছিল যে, দর্শকেরা বার বার করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। আর সেজন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষ একটা টাকা দিয়েছিলেন তিনকড়িকে

সন্দেশ খেতে। শোনা যায়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনকড়ি ঐ টাকাটি সযত্নে তুলে রেখেছিল।

এভাবে এক বছর স্টার থিয়েটারে কাজ করার পর, ৬৮-নং বিডন স্ট্রীট থেকে স্টার থিয়েটার উঠে যায়। স্টার থিয়েটারের জমিটা কিনে নিয়ে গোপাললাল শীল ঐ জমিতে এক নতুন থিয়েটার করলেন। সেই থিয়েটারের নাম হল 'এমারেল্ড থিয়েটার'। আর স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ হাতিবাগানে জমি কিনে, থিয়েটারের নতুন বাড়ি তৈরি করতে লাগলেন। বাড়ি তৈরি শেষ হতে অনেক দেরী। তাই, দলবল নিয়ে স্টার সম্প্রদায় ঢাকায় গেলেন অভিনয় করতে। তিনকড়িরও ঢাকায় অভিনয় করতে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনকড়ির মা কিছুতেই তিনকড়িকে ঢাকায় অভিনয় করতে যেতে দিলেন না। জেদী মানুষ ছিলেন তিনকড়ির মা। মেয়ের অনুনয়, কান্নাকাটি, কিছুতেই তিনি রাজী হলেন না। শোনা যায়, এর পর তিন দিন তিনকড়ি কিছু খায় নি, ওঠে নি, শুয়ে শুয়ে শুধু কেঁদেছিল।

এর পর মা-মেয়েতে বেশ কিছুদিন মন কষাকষি চলে। মেয়ে ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করে না, মায়ের সঙ্গে কথা বলে না। কিছুদিন এভাবে চলার পর, তিনকড়িদের বাড়ির এক ভাড়াটিয়া এবং তিনকড়ির মায়ের বান্ধবী তিনকড়ির মাকে জানায়, তার ঘরে এক বাবু আসেন, তাঁর একটা প্রাইভেট থিয়েটারের দল আছে, তিনকড়ি যদি সেখানে ঢুকতে চায় তো সে বলে দিতে পারে। মেয়ের মতিগতি দেখে তিনকড়ির মা শেষ পর্যন্ত মেয়েকে প্রাইভেট থিয়েটারে দিতে সম্মত হন। তিনকড়ি সেই প্রাইভেট থিয়েটারে বিভিন্ন নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে সুনাম অর্জন করে। কিন্তু দলের কর্মকর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ায় ঐ দলটি শেষ পর্যন্ত উঠে যায়।

এই সময় কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় মেছুয়াবাজারে 'বীণা থিয়েটার' নামে একটি নতুন থিয়েটারের পত্তন করেন। (শোনা যায়, যেখানে 'কীর্তি সিনেমা' ছিল, ঐখানেই নাকি বীণা থিয়েটার ছিল।)

যাই হোক, তিনকড়ি এই বীণা থিয়েটারে মাসিক ২০ টাকা মাইনেতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অভিনেত্রী হিসাবে যোগদান করে। এখানে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'মীরাবাঈ' নাটকে মীরার ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। এরপর বীণা থিয়েটারের প্রতিটি নাটকে সে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বীণা থিয়েটারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। বীণা থিয়েটারকে রাজকৃষ্ণ রায় চীপ থিয়েটাররূপে সংগঠিত করেন। কিন্তু আয়ের তুলনায় ব্যয় অত্যধিক বেশি হওয়ায় রাজকৃষ্ণ রায়ের পক্ষে থিয়েটারটিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি।

বীণা থিয়েটারের অবলুপ্তির পর মহেন্দ্রলাল বসু তিনকড়িকে গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে ডেকে নিয়ে যান। এখানে তিনকড়ির 'বীণা থিয়েটার' অপেক্ষা দ্বিগুণ মাহিনা হয়। অর্থাৎ মাসিক বেতন ৪০ টাকা। 'নন্দবিদায়' গীতি-নাট্যে বলরাম, 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে নাগরিকা, 'রাসলীলায়' বৃন্দার ভূমিকায় অবতরণ করে। কিন্তু গোপাললাল খেয়ালের বশবর্তী হয়ে থিয়েটার করতে আসেন। থিয়েটারকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গ্রহণ করেন নি। ফলে, অল্পকালের মধ্যেই থিয়েটারের অবস্থা খারাপ হয়ে আসে। গোপাললাল মহেন্দ্রবাবুকে ডেকে বলেন—'তিনকড়িকে তো আপনিই এ থিয়েটারে নিয়ে এসেছিলেন, কাজেই আপনি তিনকড়িকে ডেকে বলুন, এ সময়ে এত মাইনে দিয়ে তাকে রাখা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তবে ও যদি ২৫ টাকা কম মাইনেতে কাজ করতে রাজী থাকে, তাহলে আমরা ওকে রাখতে পারি।'

মহেন্দ্রবাবু বেশ সঙ্কোচের সঙ্গেই তিনকড়িকে কথাটা বলেন। তিনকড়ি মহেন্দ্রবাবুর কথায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে। মহেন্দ্রবাবু তিনকড়িকে শান্ত করার চেষ্টা করে বলেন—'বাড়ি গিয়ে মার সঙ্গে পরামর্শ করো। তিনি কি বলেন, কাল এসে আমায় জানিও।' তিনকড়ি বলে—'এ বিষয়ে আর পরামর্শ করার কিছু নেই। এ কথার জবাব

আমি এখুনি দিচ্ছি। আপনি থিয়েটারের মালিককে বলবেন—'তিনকড়ি তার মাইনের একটি পয়সাও কমাতে রাজী নয়।' তিনকড়ির এই কথার পরেও মহেন্দ্রবাবু বলতে থাকেন—'দেখ, কোন থিয়েটারের অবস্থাই এখন ভাল নয়। এখান থেকে ছেড়ে গেলে আর কেউ যে তোমায় বেশি মাইনে দিয়ে নিয়ে যাবে, তা তো আমার মনে হয় না। তাই বলছিলাম, থিয়েটার ছেড়ে বাড়ীতে বসে থাকার চেয়ে—'

মহেন্দ্রবাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনকড়ি বলে—'এই হীনতা স্বীকার করে এখানে কাজ করার চেয়ে, ভিক্ষে করে খাওয়াও ভাল। আপনি গোপালবাবুকে বলে দেবেন, তিনকড়ি কাল থেকে আর থিয়েটারে আসবে না।'

আত্মসম্মান আর আত্মমর্যাদা বজায় রেখে, সোজা কথায় জবাব দিয়ে বাড়ি চলে এল তিনকড়ি।

তিনকড়ি এক কথায় থিয়েটারের চাকরিতে জবাব দিয়ে এল। অথচ থিয়েটার ছাড়তে চায়নি বলে, এর কিছুদিন আগে তাকে তার মায়ের হাতে কম লাঞ্ছনা সইতে হয়নি। থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে শুনে, তার মা হয়ত আজ খুবই খুশি হবেন। কিন্তু তিনকড়ি? সে কি থিয়েটার ছেড়েছে খুশি মনে? তিনকড়ির এই চাকরি ছাড়ার মধ্যে আত্মসম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। কিন্তু তার মা যে কারণে সেদিন থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্যে জেদ করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল আত্ম-গ্লানি আর উপজীবিনীর ঘৃণ্য জীবনযাপনের প্রশ্ন।

ঘটনাটি ঘটেছিল বীণা থিয়েটারেই থাকাকালীন। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'মীরাবাঈ' নাটকে মীরার ভক্তি-রস-সিঞ্চিত ভূমিকাটি অভিনয়ে ও গানে মূর্ত করে তুলেছিল তিনকড়ি। অভিনয়ের সঙ্গে তার দেহলাবণ্য দর্শকদের সহজেই আকৃষ্ট করেছিল। তিনকড়ি অভিনয়ের পর একদিন বাড়ি এসে দেখে, দু'টি সুদর্শন ও সুবেশধারী যুবাপুরুষ তার মায়ের সঙ্গে কথা কইছেন। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল তিনকড়ি। মা সস্নেহে মেয়েকে ডেকে পাশে বসালেন। মায়ের

পাশটিতে জড়সড় হয়ে বসল তিনকড়ি। মা যুবক তুটির সঙ্গে মেয়ের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—এই আমার মেয়ে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা বীণা থিয়েটারে দেখেছি ওঁর অভিনয়।

অপর একজন বলে ওঠেন—বড় ভাল অভিনয় করেছেন। যেমন এ্যাকটিং তেমনি গান। সত্যি কথা বলতে কি, ওঁর অভিনয়ে আমরা মুগ্ধ। আর সেইজন্যেই তো এসেছি। আপনি যা চেয়েছেন, তা দিতে আমবা রাজী। আপনার মেয়েকে কিন্তু থিয়েটার ছেড়ে দিতে হবে।

ভদ্রলোকের কথা শুনে ব্যাপারটা তিনকড়ির কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। কি উদ্দেশ্যে ওঁরা এসেছেন, বুঝতে পারল তিনকড়ি। মাও মেয়ের মুখেব দিকে চেয়ে বোধহয় মেয়ের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বাবু তু'টির উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমার মেয়ের থিয়েটারের বড় শখ। এই কিছুদিন হল থিয়েটারে ঢুকে যা হোক একটু-আধটু নামও করেছে। কিছু মাইনেও পাচ্ছে। তাই চট্ করে থিয়েটার ছাড়াতে মন চাইছে না। তা আপনারা আসা-যাওয়া করুন। থিয়েটার ছাড়াতে আর কতক্ষণ !'

বাবুদের মধ্যে একজন বলে বসলেন,—না, তা হবে না। থিয়েটার আপনাকে ছাড়াতেই হবে। আপনার মেয়ে যদি বেশির ভাগ সময় থিয়েটার নিয়েই মেতে থাকে, তাহলে আমরা আসি কখন? আপনি তু'শো টাকা চেয়েছেন, আমরা তা দিতে রাজী। আপনার মেয়ে থিয়েটাবে যা পায়, যদি চান তো সে টাকাটাও আমরা ধরে দিতে রাজী আছি। আমাদের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তাহলে ছ'মাসের টাঁকা আগাম দিয়ে দিচ্ছি। তবে আপনার মেয়েকে থিয়েটারের কাজে ইস্তফা দিতেই হবে।

বাবুটির কথার উত্তরে তিনকড়ির মা বললেন—কাল তো আপনারা আসছেন, সে যা হোক করা যাবে।

তিনকড়ির মায়ের কথার উত্তরে আর একজন বলে ওঠেন—যা হোক বললে চলবে না। মোট-কথা, থিয়েটার আপনার মেয়েকে ছাড়তেই

হবে। যদি আপনি পাকা কথা দেন, তাহলে আমরা কাল টাকাকড়ি নিয়ে আসব।

উত্তরে তিনকড়ির মা বলেন—তা বেশ তো, আসবেন।

বাবু দু'টি উঠে দাঁড়ালেন—ঘর থেকে বেরুবার আগে জানিয়ে গেলেন, কাল সন্ধ্যায় তাঁরা টাকাকড়ি নিয়ে আসবেন। এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন, তিনকড়ি যেন থিয়েটারে না যায়।

উত্তরে তিনকড়ির মা জানালেন—সে কি কথা! আপনারা আসবেন, আর ও থিয়েটারে যাবে? তাও কি হয়?

এইভাবে পাকা কথা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাবু দু'টি চলে গেলেন।

এই ঘটনাটি তিনকড়ি তার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করে বলেছে—

"ভদ্রলোক দুইটি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি যেন দম ফেলিয়া বাঁচিলাম। তাঁহারা এমন কড়া আতর মাখিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহারা চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু সমস্ত ঘরটা সেই আতরের গন্ধে ভরভর করিতে লাগিল। তাঁহারা চলিয়া যাইবা মাত্র আমি মাকে বলিলাম, 'মা, আমি থিয়েটার কিছুতেই ছাড়ব না, তা তুমি আমায় যাই বল আর যাই কর।'

মা আমার কথার উত্তরে বেশ মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলিলেন, 'ছি, এমন বেয়াড়াপানা কি করতে আছে? এত বড় একটা দাঁও কি হাতছাড়া করা যায়? ওরা বড়লোক, ওদের আশ্রয়ে থাকলে তোর আর কি ভাবনা থাকবে? গহনায় সমস্ত গা একেবারে মুড়ে যাবে। থিয়েটার করে কি এমন চতুষ্পদ লাভ করবি?'

আমার কিন্তু এক কথা, আমি থিয়েটার ছাড়বো না।

মা আমাকে অনেক রকমে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে না চাওয়ায় শেষে তিনি আমাকে যা-তা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভবী ভুলিবার নহে, আমি কিছুতেই থিয়েটার ছাড়িতে সম্মত হইলাম না, পরদিন প্রভাত হইতে বাড়ির আর সবাই মিলিয়া একে একে আসিয়া আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন,

থিয়েটার করিয়া কোনই লাভ নাই, থিয়েটার করিয়া কাহারও দুঃখ ঘুচিতে পারে না ইত্যাদি। আমি কাহারও কথাব কোন জবাব দিলাম না, রাত্রি হইতেই একেবারে গুম্ খাইয়া গিয়াছিলাম। মা আমায় শেষে একথা বলিতেও ভুলেন নাই যে, যদি আমি তাঁহার কথার অবাধ্য হই, তাহা হইলে তিনি আব আমায় আস্ত রাখিবেন না। মা যদিও আমায় সেদিন দুইশতবার থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি থিয়েটারে চলিয়া গেলাম। রাত্রে বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, সেই ভদ্রলোকেরা সন্ধ্যার পরই আসিয়াছিলেন এবং আমি থিয়েটারে চলিয়া গিয়াছি শুনিয়া মাকে দুই চারটি শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হইল আমার যেন ঘাম দিয়া জ্বব ছাড়িয়া গেল।

আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া মার নিষেধ সত্ত্বেও থিয়েটারে চলিয়া যাওয়ায় মা রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়াছিলেন। আমি বাড়ী ফিরিবামাত্র তিনি একখানা বাখারী দিয়া আমাকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে আমার জ্বর আসিয়া গেল। আমি তিনদিন জ্বরে বেহুঁশ হইয়া ছিলাম। জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া আবার আমি নিয়মিত থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু উপরিলিখিত ঘটনার পর বহুদিন পর্যন্ত মা আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই। আমি প্রায়ই শুনিতে পাইতাম, মা তাঁহার সমবয়স্কাদিগকে বলিতেছেন, অমন বেয়াড়া মেয়ের মুখ দেখতে আছে? এখন ভাল কথা শুনল না এরপর শেষে পস্তাতে হবে। আমি তো ওকে আর কোন কথা বলব না, ওর যা ভাল বিবেচনা হয় করুক আমার কি?

তথাপি ইহার পরেও মা আমাকে থিয়েটার ছাড়িয়া দিবার জন্য বহুবার বলিয়াছেন। কিন্তু ভগবান তখন আমায় কি সদ্‌বুদ্ধি দিয়াছিলেন জানি না, আমি শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও কিছুতেই থিয়েটার ছাড়িতে রাজী হই নাই। মাতার অবাধ্য হইবার জন্য প্রহার তো যথেষ্টই

খাইয়াছি ; এমন কি, একবার মা আমায় দুইতিন দিন খাইতে পর্যন্ত দেন নাই। কিন্তু তবু আমি থিয়েটার পরিত্যাগ করি নাই। নটনাথের নিতান্ত কৃপায় আমি যে কত কত গুরুতর প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছি, তাহা কেবল অন্তর্যামী জানেন, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে।"

যাই হোক, বীণা থিয়েটারের পর, এমারেল্ড থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়ে চাকরিতে জবাব দিয়ে এসে, বেশীদিন বসে থাকতে হয়নি তিনকড়িকে। সিটি থিয়েটারের কর্তা নীলমাধব চক্রবর্তী তিনকড়িকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে যান সিটি থিয়েটারে। সেটা ১২৯৮ সাল। সিটি থিয়েটারে তিনকড়ির মাসিক মাইনে ধার্য হয়েছিল ৪০ টাকা, অর্থাৎ এমারেল্ড থিয়েটারে যা পেত তিনকড়ি, সেই মাইনেতেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল সিটি থিয়েটারে। এখানে এসে তিনকড়ি 'সরলা' নাটকে—গদাধরের মা, 'বিল্বমঙ্গলে'—বণিক পত্নী, 'চৈতন্যলীলায়'—ভক্তি, 'তরুবালায়'—দামিনী ও 'সধবার একাদশীতে'—কাঞ্চনের ভূমিকায় সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করে।

যে চারজন মহিলা প্রথম বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন তাঁদের অন্যতমা শ্রীমতী জগত্তারিণী তখন এই সিটি থিয়েটারে অভিনেত্রীর কাজ করতেন। 'বিবাহবিভ্রাট' নাটকে জগত্তারিণী ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। জগত্তারিণীর এই অভিনয় তিনকড়ির মনঃপূত হতো না। মনে হতো স্টার থিয়েটারে যিনি এই ভূমিকায় অভিনয় করতেন, তাঁর কাছে জগত্তারিণী যেন কিছু নয়। স্টার থিয়েটারে থাকাকালীন এই ভূমিকাটি আয়ত্ত করে রেখেছিল তিনকড়ি। একদিন নীলমাধববাবুকে বলে বসলো, 'ঐ ঝিয়ের পার্টটা ঠিক হচ্ছে না, ওটা আমাকে একদিন করতে দিন।' তিনকড়ির কথা শুনে নীলমাধববাবুর মনে হল, একটা দুঃসাহসিক প্রস্তাব করে বসেছে সে। তাই তিনকড়ির কথার উত্তরে বলেন—"ঐ কঠিন ভূমিকা অভিনয় করতে জগত্তারিণী হিমসিম খাচ্ছে, ও-পার্ট কি তুমি করতে পারবে ?"

তিনকড়ি বলে, "বেশ তো, পারি কি না পারি, পরীক্ষা করেই দেখুন না।" তিনকড়ির সাহস দেখে, সত্যিই একদিন নীলমাধববাবু গোপনে তিনকড়ির মুখ থেকে পার্টটা শুনলেন। তার বলার ভঙ্গিমা এবং সেই সঙ্গে তার নিখুঁত অঙ্গভঙ্গি, নীলমাধববাবুকে বিস্মিত করে তুললো। একদিন 'বিবাহবিভ্রাট' নাটকে ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ দিলেন তিনকড়িকে। সেদিন দর্শকদের কাছ থেকে অজস্র প্রশংসা পেল তিনকড়ি। আর সেদিন থেকেই 'বিবাহবিভ্রাট' নাটকে ঝিয়ের ভূমিকায় সে নিয়মিত অভিনয় করতে লাগল।

পূজো উপলক্ষে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়িতে অভিনয়ের বায়না পেয়েছে সিটি থিয়েটার। গিরিশচন্দ্র নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়িতে। আর পাঁচজন বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে অভিনয় দেখছেন গিরিশচন্দ্র। অভিনয়ের শেষে গিরিশচন্দ্রকে সকলে সাজঘরে নিয়ে গেল। গিরিশচন্দ্রের মত দর্শককে পেয়ে সিটি থিয়েটার আজ ধন্য। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পায়ের ধুলো নিলেন গিরিশচন্দ্রের। সেই সঙ্গে তিনকড়িও এসে প্রণাম করল গিরিশচন্দ্রকে। গিরিশচন্দ্র সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন তিনকড়িকে। তারপর নীলমাধববাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"ওর ওপর নজর রেখ নীলমাধব। ওর গলার স্বরটি ভারি মিষ্টি, চেহারাটিও অভিনেত্রীরই উপযুক্ত। ওকে যদি ঠিকমত শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পার, তাহলে আমি বলছি ও একদিন নিশ্চয়ই বড় অভিনেত্রী হবে।"

গিরিশচন্দ্রের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয়নি। সত্যিই তিনকড়ি উত্তর-কালে একজন বড় অভিনেত্রী হয়েছিল।

মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক তখন নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। আর গিরিশচন্দ্র তখন মিনার্ভা থিয়েটারের নাট্যকার ও পরিচালক। 'ম্যাকবেথ' নাটকের মহলা চলছে। একদিন তিনি লোক পাঠালেন তিনকড়ির কাছে। গিরিশচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত আহ্বানে তিনকড়ি অভিভূত হয়ে পড়ল। কোনদিন কল্পনাও করেনি যে, গিরিশচন্দ্র

মিনার্ভার মত অভিজাত বড় থিয়েটারে কাজ করার জন্য তাকে ডেকে পাঠাবেন। যথাসময়ে থিয়েটারের গাড়ি এল তিনকড়িকে নিয়ে যেতে। নানা রকম দ্বিধা আর সঙ্কোচ নিয়ে গাড়িতে উঠল তিনকড়ি। প্রমদা-সুন্দরী তখন মিনার্ভা থিয়েটারের সবচেয়ে বড় অভিনেত্রা। গিরিশবাবু তখনও থিয়েটারে এসে পৌছননি। তিনকড়ি মহলার জায়গায় মেয়েদের কাছে গিয়ে সসঙ্কোচে বসল। অপরিচিতা মেয়েটির দিকে নজর পড়ল প্রমদাসুন্দরীর। পাশের অপর একটি মেয়েকে প্রমদাসুন্দরী জিজ্ঞেস করলেন, "ও মেয়েটি কে ? আজ থেকে নতুন এল বুঝি ?" প্রমদাসুন্দরীর কথার উত্তরে পাশের মেয়েটি জানায়, "কি জানি, দেখে তো সেই রকমই মনে হচ্ছে।" ইতিমধ্যে থিয়েটারের জনৈক কর্মচারী এসে তিনকড়িকে ডেকে নিয়ে যায়। বলে, "এস, গিরিশবাবু এসেছেন, তোমায় ডাকছেন।"

গিরিশচন্দ্র বসে আছেন তাঁর ঘরে। থিয়েটারের কর্মচারীটির সঙ্গে তিনকড়ি সেখানে এসে গিরিশচন্দ্রকে প্রণাম করল। গিরিশচন্দ্র অভিনয় সম্পর্কে তাকে নানা রকম উপদেশ দিলেন—যা আজ পর্যন্ত কোন নাট্য-শিক্ষকের কাছেই সে পায়নি। মনে মনে ভাবে, এতদিন পরে সত্যিকারের গুরু পেল। গিরিশচন্দ্র কর্মচারীটিকে নির্দেশ দিলেন তিনকড়ির সঙ্গে এক বছরের একটা চুক্তিপত্র করে নেওয়ার জন্য। মাইনে ধার্য হল মাসিক তিরিশ টাকা।

নিয়মিত থিয়েটারের গাড়ি আসে তিনকড়ির কাছে। মহলায় যায়। 'ম্যাকবেথ' নাটকে তার কোন ভূমিকা নেই। শুধু শিল্পীদের মহলা শোনে আর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-শিক্ষাদানের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! মনে মনে ভাবে তিনকড়ি, আরো কিছুদিন আগে যদি গিরিশচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসতে পারত, তাহলে কত কী না শিখতে পারত।

অপরিসীম পরিশ্রম করে চলেছেন গিরিশচন্দ্র 'ম্যাকবেথ' নাটককে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। প্রমদাকে লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায়

শিক্ষাদানের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। কিন্তু প্রমদার চলা-বলা কিছুই মনঃপূত হচ্ছে না গিরিশচন্দ্রের। শেষে একদিন ধৈর্যের বাঁধ হারিয়ে ফেলেন গিরিশচন্দ্র। বিরক্তি প্রকাশ করেন প্রমদার প্রতি। তারপর তিনকড়িকে বলেন, লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় মহলা দেবার জন্য। তিনকড়ি কল্পনাও করেনি যে নাম-ভূমিকায় মহলা দেবার জন্য তাকে গিরিশচন্দ্র আদেশ করবেন। তিনকড়ি গিরিশচন্দ্রের কাছে একটি দিন সময় চেয়ে নেয়, পার্টটিকে ভাল করে পড়ে নেবার জন্যে। তার পরের দিন থেকে, মহলা দিতে থাকে লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায়। গিরিশচন্দ্র খুশি হন সংলাপ বলা ও সেই সঙ্গে তার অভি-ব্যক্তি প্রকাশকের ক্ষমতা দেখে। গিরিশচন্দ্র যেমনটি শিক্ষা দেন, তিনকড়ি হুবহু তা আয়ত্ত করে।

১৮৯৩ সালের ২৮শে জানুয়ারি, বাং ১২৯৯, ১৬ই মাঘ, মিনার্ভা থিয়েটারে 'ম্যাকবেথ' মঞ্চস্থ হল। গিবিশচন্দ্র ম্যাকবেথ আর লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় তিনকড়ি। দর্শকেবা বাব বার করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করল তিনকড়িকে। আর অভিনয়ের শেষে নটগুরু তাকে আশীর্বাদ করে বললেন—"তোমার অভিনয় দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে বই লেখা আমার সার্থক হয়েছে। বাঙ্গালী দেখুক যে বাংলা রঙ্গমঞ্চেও অভিনেত্রী আছে; এত সুন্দর, এত নিখুঁত যে তুমি অভিনয় করতে পারবে একথা আমি একবারও ধারণা করতে পারিনি। আমি তোমাকে আর কি আশীর্বাদ করব? তবে এই আশীর্বাদ করি যে, তুমি যথার্থ অভিনেত্রী হও। এমন অভিনয় কর যে যতদিন থিয়েটার থাকবে, ততদিন বাঙ্গালী যেন তোমার কথা ভুলতে না পারে।"

সত্যই বাংলার নাট্যমোদীরা ভুলতে পারেনি তিনকড়িকে। বাংলার নাট্যশিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে তিনকড়ি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। 'ম্যাকবেথে'র পর মিনার্ভার 'মুকুল মুঞ্জুরা'। এই নাটকে তারার ভূমিকায় অভিনয় করে তিনকড়ি অভিনয় প্রতিভার আর একটি স্বাক্ষর রাখল। গিরিশচন্দ্র সানন্দে ঘোষণা করলেন—"তিনকড়িই এখন বঙ্গ

রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।" এর পর 'আবুহোসেন'-এ দাই আর 'জনা' নাটকে জনার ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্যমোদী সুধীজনের অজস্র প্রশংসা লাভ করলো। পরপর নানা রসের ও নানা স্বাদের নাটকে অভিনয় করে তিনকড়ি সেদিন নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠাভিনেত্রীর আসনে অভিষিক্ত হল। আর সেই সঙ্গে তার অভিনেত্রীসুলভ চেহারার জৌলুসে অনেকেই আকৃষ্ট হলেন। 'জনার' পরের নাটক 'করমেতিবাঈ'। এ নাটকেরও নাম-ভূমিকায় তিনকড়ি। তখন তার যথেষ্ট নামডাক হয়েছে। কাজেই, 'করমেতি'র প্রথম অভিনয় রজনীতে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

অভিনয় আরম্ভের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, অথচ পটত্তোলন হচ্ছে না। বাইরে দর্শকদের হৈ-চৈ। কি ব্যাপার? কিছু অঘটন ঘটল নাকি? গিরিশচন্দ্র ছুটে এলেন সাজঘরে। শুনলেন, তিনকড়ি বিধবার বেশে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে চাচ্ছে না। করমেতি বিধবা। অথচ বিধবা সাজবে না? শিল্পীর খেয়ালখুশি ও মর্জির ওপর নির্ভর করে থিয়েটার চলবে নাকি? গিরিশচন্দ্র রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন—"যাকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নেওয়া যায়, অমনি সে মনে করে আমি কি হলাম! এ জাতের স্বভাবই এই। যাক, কাউকে দরকার নেই। নাপিত ডাক। আমিই আজ করমেতি সাজব।" ইতিমধ্যে নাগেন্দ্রবাবু রোগ ও রোগীর খবর নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। গিরিশচন্দ্রকে জানালেন—"তিনকড়ির বাবু বক্সের টিকিট কিনে বসে আছেন। তাই তিনকড়ি থান পরে স্টেজে বেরুতে রাজী হচ্ছে না। যাই হোক, আমি বাবুটিকে বিনীতভাবে সব কথা বলায়, বাবুটি চলে গেলেন।" বাবুটির চলে যাওয়ার সংবাদে শুধু তিনকড়ি নয়, সকলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঘণ্টা পড়ল। ড্রপ উঠল। শুরু হল অভিনয়। থান পরে অভিনয় করার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যিনি, তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই থান পরেই অপূর্ব কেরামতি দেখাল তিনকড়ি করমেতিবাঈ-এর ভূমিকায়। করমেতিবাঈ-এর প্রথম অভিনয় রজনীর

ঘটনা নিছক ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ঘটনার পর, তিনকড়ি গিরিশচন্দ্রের কাছে ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল। মানুষ হিসেবে তিনকড়ি সত্যিই ভাল ছিল। গিরিশচন্দ্র যখন যে থিয়েটারে গিয়েছেন, তিনকড়িকেও সেই থিয়েটারে নিয়ে গেছেন। গিরিশচন্দ্র তিনকড়ির প্রসঙ্গে বলেছেন—"শুধু সু-অভিনেত্রী বলেই আমি তিনকড়িকে স্নেহ করি না, তার মধ্যে অনেক গুণ আছে—যা দিয়ে সে আমাকে মুগ্ধ করেছে।"

মিনার্ভা থিয়েটারের পর, সেকালের প্রায় প্রতিটি রঙ্গমঞ্চেই কাজ করেছে তিনকড়ি। বিভিন্ন রসের ও বিভিন্ন স্বাদের বহু নাটকে আত্ম-প্রকাশ করেছে—বিভিন্ন চরিত্রে। সুভদ্রার ভূমিকায় 'পাণ্ডবগৌরব' নাটকে তার গাওয়া গান—

"ধিয়া তাধিয়া নরমালী।
ঘোরাননা রক্তদশনা দিগঙ্গনা করালী।"

এই গানটি সে যুগে দর্শকের কাছে এমনই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, তখন অনেকের মুখেই এই গানটি শোনা যেত। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে পাগলিনীর ভূমিকায় অনেকেই অভিনয় করেছেন। কিন্তু তিনকড়ির মত অমন নিখুঁত অভিনয় আর কেউই করতে পারেন নি। 'ভ্রান্তি' নাটকে অন্নদার চরিত্রটি খুবই জটিল। এই জটিল ভূমিকায় দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে তিনকড়ি নাট্যামোদী সুধীজনের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে জিজাবাঈ-এর ভূমিকায় সে যখন বলত—"যদি দেশের জন্য প্রয়োজন হয়, তাহলে তোমার মায়ের মুণ্ড ছেদন করতেও দ্বিধা কোরো না" তখন দর্শকেরা তার অভিনয় দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে উঠত।

অভিনেত্রী হিসাবে তিনকড়ি যখন একক এবং অদ্বিতীয়া, সেই সময় উত্তর কলকাতার নামকরা এক বড়লোকের নজর পড়ল তার ওপর। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বড়লোকটির হৃদ্যতা ছিল। রাজেন চাটুজ্জ্যে নামে গিরিশচন্দ্রের অপর এক বন্ধুরও ঐ বড়লোক বাবুটির আড্ডায় যাওয়া-

আসা ছিল। বাবুটির বাগানবাড়ি ছিল সিঁথিতে। প্রায়ই সেখানে মাইফেল বসত। রাজেন চাটুজ্জ্যে, গিরিশচন্দ্র তো যেতেনই, মধ্যে মধ্যে তিনকড়িরও ডাক পড়ত মাইফেলের আসরে। বাবুটি তিনকড়িকে একান্তভাবে কাছে পেতে চান। প্রস্তাব করেছেন, থিয়েটার ছেড়ে তিনকড়ি তাঁর অধীনে থাকুক। সোনাদানা, হীরে-জহরত আর সেই সঙ্গে টাকাপয়সা, গাড়ি-বাড়ি সবই দেবেন তিনি। কোন অভাবই রাখবেন না তিনকড়ির। বাবুটির প্রস্তাবের উত্তরে তিনকড়ি জানিয়েছিল, ভেবেচিন্তে জানাবে।

ভাবা মানে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করা। তিনকড়ির কাছে সব শুনে, গিরিশচন্দ্র থিয়েটার না ছাড়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। বাবুটির প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়—তা দু'দিন বাদেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল তিনকড়ি। ধুরন্ধর বাবুটির বুঝতে দেরী হল না যে গিরিশচন্দ্র থাকতে তিনকড়িকে কাছে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মনে মনে ঠিক করলেন, গিরিশচন্দ্রকে সরিয়ে দেবেন পৃথিবী থেকে।

কিছুদিন পরে বেশ খোলা মন নিয়েই বাবুটি আবার মাইফেলের নেমন্তন্ন করে পাঠালেন গিরিশচন্দ্র, রাজেনবাবু আর তিনকড়িকে। আর সেই সঙ্গে একথাও জানালেন যে, এবার আর সারারাত ধরে মাইফেল হবে না। ওতে শরীর খারাপ হয়। রাত বারোটায় শেষ করা হবে এবারের আসর। আর গিরিশচন্দ্রকে চুপি চুপি বলে রাখলেন বড় মানুষটি—"দেখুন, রাত বারোটা পর্যন্ত মাইফেল অন্যদের জন্য। আপনার জন্যে নয়।" বেশ কথা। বাবুর নির্দেশমত নির্ধারিত দিনে গিরিশচন্দ্র ও তিনকড়ি সন্ধ্যেয় এসে আসরে বসলেন, সিঁথির বাগানবাড়িতে। রাজেনবাবু সন্ধ্যার একটু পরেই সেখানে এসে ঢুকলেন। মাইফেলের আসরের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে গাছতলায় ও কে ঘাপ্‌টি মেরে দাঁড়িয়ে আছে? গোলাপ সিং না? রাজেনবাবু গোলাপ সিংকে বেশ ভালভাবেই জানেন। এক সময় কিছুকাল সে কাজও করেছে রাজেনবাবুর অধীনে। আজ শহরের সে নাম-

করা গুণ্ডা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন রাজেনবাবু। অনুমান মিথ্যে নয়—গোলাপ সিং-ই বটে। লম্বা সেলাম ঠুকল গোলাপ সিং রাজেনবাবুকে দেখে। কেন সে এখানে এসেছে জানতে চাইলেন রাজেনবাবু। —রাজেনবাবুকে সে প্রথমে বলতেই চায় না আসল কথাটা। তারপর চুপি চুপি যে কথা জানাল, তাতে তো রাজেনবাবু রীতিমত চিন্তিত ও ভীত হয়ে উঠলেন। বাবুটির নির্দেশে গোলাপ সিং গিরিশচন্দ্রকে আজ রাতেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে। গিরিশচন্দ্রকে খুন করার পর, তাঁর দেহটা মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে। গর্ত খোঁড়া আছে। আর সেই সঙ্গে ঘাসের চাব্‌ড়া সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। মাটি দিয়ে গর্তটা ভরাট করে তার ওপর ঘাসের চাব্‌ড়া বসিয়ে দেওয়া হবে। যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে, লাশ পুঁতে রাখা হয়েছে। রাজেনবাবু ভাবতে লাগলেন কি করে গিরিশচন্দ্রকে রক্ষা করা যায়, কি করে তিনকড়িকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় ঐ বাবুটির কবল থেকে। বাগানবাড়ির অন্দিসন্দি ভালভাবেই জানা ছিল রাজেনবাবুর। গিরিশচন্দ্র যেখানে যেতেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর চাকর ফকিরও যেত সেখানে। তিনি প্রথমে ফকিরকে ডেকে চুপিচুপি বলে দিলেন, একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি ডেকে এনে সিঁথির মোড়ে সে যেন অপেক্ষা করে। ফকির কাল বিলম্ব না করে রাজেনবাবুর নির্দেশমত চলে গেল। আর রাজেনবাবু সুকৌশলে গিরিশচন্দ্র ও তিনকড়িকে সকলের অজ্ঞাতসারে পাচার করে দিলেন বাগানবাড়ির বাইরে। গিরিশচন্দ্র বেঁচে গেলেন সে যাত্রায়। তিনকড়ি চলে গেল বাবুটির নাগালের বাইরে। বাবুটির সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল।

সে যুগে রঙ্গজগতের মানুষদের কাছে গিরিশচন্দ্র ও তিনকড়িকে নিয়ে প্রণয় ঘটিত যে সব কাহিনীর গুঞ্জরণ শোনা যেত, তার মধ্যে উপরোক্ত কাহিনীটি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

শেষ জীবনে তিনকড়ি বেশ কয়েক বছর ডায়েবিটিস্ রোগে ভুগেছিল। এক সময়ে সে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে কাশীতে যায়।

দীর্ঘদিন পরে ফিরে এলে, থিয়েটারের মালিকরা একে একে সকলেই তাকে মঞ্চে ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করেন। কিন্তু রাত্রি জাগরণ ডাক্তারের নিষেধ থাকায় সে সকলকেই ফিরিয়ে দেয়। এই সময় গিরিশচন্দ্র বলে পাঠান—"কৈশোর হইতেই থিয়েটার করা অভ্যাস। আমার মতে সে অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করিয়া নীরবে বাড়িতে বসিয়া থাকা উচিত নয়। তোমার থিয়েটাবে যোগদান করাই উচিত। তবে পরিশ্রম অধিক না হয়, সেটুকুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" গিরিশচন্দ্রের নির্দেশমত তিনকড়ি বাং ১৩২৪ সালে 'থেস্‌পিয়ান থিয়েটারে' যোগদান করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাতে একটা কার্বঙ্কল হয়।

কার্বঙ্কল্ অপারেশন করার পর, পাঁচ ছয় দিন বেশ ভালই ছিল। কিন্তু সহসা অবস্থার অবনতি ঘটে। শেষ পর্যন্ত এই রোগেই তিনকড়ির মৃত্যু হয়। সে নিঃসন্তান ছিল।

১৯২৬ সালে মৃত্যুর পূর্বে তিনকড়ি একটি উইল করে। ঐ উইলের শর্তানুসারে তার দুইখানি বাড়ি বড়বাজার হাসপাতালকে অর্থাৎ মেয়ো হাসপাতালকে ও একখানি বাড়ি তার বাবুর পুত্রকে দান করা হয়। আর তার অলঙ্কার এবং আসবাবপত্র বিক্রয়ের টাকায় তার বাড়ির ভাড়াটেদের প্রত্যেককে ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। বাকী টাকা তার শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারে খরচ করা হয়েছিল।

রঙ্গমঞ্চের নেপোলিয়ান অমরেন্দ্রনাথ .

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাস নানা কারণে বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। কারণ, সাধারণ রঙ্গালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রতিষ্ঠাতারা ভবিষ্যতের কোন সুষ্ঠু কর্মসূচী গ্রহণ না করেই, কানাকড়ি সম্বল করে কালসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন। ফলে, বার বার রঙ্গালয় পরিচালনাব ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে। একই রঙ্গশালার বার বার হাত বদল হয়েছে। নতুন কর্ণধার এসে রঙ্গালয়ের হাল ধরেছেন। দেনার দায়ে হাল ছেড়েছেন। আবার, নতুন লোক এসে ভরাডুবি নৌকার হাল ধরেছেন। মধ্যে মধ্যে আবার এমন করিৎকর্মা পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর কর্মদক্ষতায় আশার আলো দেখা দিয়েছে।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ২৫ বছর পরে এমন এক দিকৃপাল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি রঙ্গালয়ের সার্বিক উন্নতির জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করে, শেষ জীবনে নিঃস্ব হয়েছিলেন। ইনি নট-নাট্যকাব ও নাট্য-নির্দেশক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। নাট্যশালার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। অমরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭৬ সালে। অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চার বছর পরে।

কলিকাতার কায়স্থ সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন চোরবাগানের দত্ত পরিবারে অমরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সেকালে চোরাবাগানে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে বার মাসে তের পার্বণ লেগে থাকত। সেই সঙ্গে থিয়েটার, যাত্রা, গান-বাজনার আসর বসত। 'সধবার একাদশী'র সপ্তম অভিনয় হয়েছিল এই চোরাবাগানের দত্তবাড়িতে। চোরবাগানের দত্ত পরিবার কলকাতার আদি বাসিন্দা। এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, ওখানেই ছিল দত্ত পরিবারের বাসস্থান। পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দত্ত পরিবারকে (গোবিন্দপুরে) চোরবাগানে একখণ্ড জমি দান করেন। এর পর এঁরা ঐ চোরবাগান অঞ্চলে

মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে বসতবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। এই অভিজাত বংশেই পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নট-নাট্যকার ও নাট্য-নির্দেশক অমরেন্দ্রনাথ।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার যুগে অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন মঞ্চ-জগতের অন্যতম প্রাণপুরুষ ও অভিনয় জগতের প্রধান আকর্ষণ। মাত্র ১৯ বছর বয়সে ১৮৯৭ সালে ১২০০ টাকা অগ্রিম দিয়ে ও মাসিক ২৫০ টাকায় ভাড়া নিয়ে এমারেল্ড-এর নতুন নামকরণ করেন 'ক্লাসিক থিয়েটার'। এর পূর্বে ১৮৯৫ সালে তিনি শৌখিন নাট্য দলে 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

কলিকাতা শহরের এক বনেদী বংশের সন্তান হয়ে থিয়েটার পরিচালনার কাজে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর আত্মীয়-পরিজনরা যেমন তাঁকে ভাল চোখে দেখেননি, তেমনি সেকালের শিক্ষিত সমাজের কাছেও তাঁকে নিন্দনীয় হতে হয়েছে। তথাপি নটনাথের সেবায় সমাজ-সংসার ত্যাগ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

তাঁর মধ্যমাগ্রজ সে যুগের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বাগ্মী ও মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে এ কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। অত্যন্ত একরোখা জেদী মানুষ ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। এই থিয়েটারের ব্যবসা পরিচালনার ব্যাপারে বহু মামলা-মোকদ্দমার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। এমন কি নটগুরু গিরিশচন্দ্রের সঙ্গেও মামলা করতে হয়েছে। মিনার্ভা ও ক্লাসিক থিয়েটারে একই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' মঞ্চস্থ হয়। মিনার্ভায় সীতারামের নাট্যরূপ দেন গিরিশচন্দ্র এবং ক্লাসিকে নাট্যরূপ দেন অমরেন্দ্রনাথ। উভয়েই নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অমরেন্দ্রনাথ সদম্ভে প্রচারপত্রে লিখেছিলেন—

"অশ্বপৃষ্ঠে 'সীতারাম'—কি অপূর্ব শোভা!
ছুটে যেন রোধিবারে গিরিশ-প্রতিভা!

নটগুরু সনে রণ
দম্ভে করে আস্ফালন
ক্লাসিকের 'সীতারাম' বলদৃপ্ত যুবা।" •

কিন্তু তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল যে, কখনো কোন কারণে যাঁদের প্রতি তিনি বিরূপ হয়েছেন, বহু ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আবার তাঁদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে সখ্যতা স্থাপন করেছেন।

তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল অপরিসীম। থিয়েটারের দর্শক বৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পে তিনি নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আর এর জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করে তিনি দেউলের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। দীন-দুঃখী কেউ তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এলে, ধার করেও তাদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেছেন। শেষ জীবনে তিনি নিঃস্ব হয়ে, থিয়েটারের অভিনেতা-ম্যানেজারের চাকুরি করতে বাধ্য হয়েছেন।

অমরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম রঙ্গালয় সম্পর্কিত 'সৌরভ', 'রঙ্গালয়' ও 'নাট্যমন্দির' নামক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন। সে যুগের সুষ্ঠু সম্পাদিত এই মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি নাট্য-গবেষকদের কাছে বর্তমানে মূল্যবান দলিলরূপে আদৃত হচ্ছে।

থিয়েটারের দর্শক বৃদ্ধিকল্পে অমরেন্দ্রনাথ দর্শকদের নানারূপ উপহার দিয়ে পরিতুষ্ট করেছেন। থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তিনি চমক সৃষ্টি করে গেছেন। রঙ্-বেরঙের পোস্টার, হ্যাণ্ডবিল, ছাপিয়েছেন। গ্রীষ্মের দিনে পেস্ট্‌বোর্ডের পাখায় প্রোগ্রাম ছাপিয়ে দর্শকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। দর্শকেরা সেই হাতপাখায় একাধারে হাওয়া খেয়েছেন ও প্রোগ্রাম দেখেছেন। থিয়েটার ব্যবসা পরিচালনার কাজে তাঁর অনুসৃত পথ আজও থিয়েটার ব্যবসায়ীরা অনুসরণ করে চলেছেন।

চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম যুগে দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্য নাটকের মধ্যে ছায়াছবির কিছু কিছু টুকরো দৃশ্য দেখানোর ব্যবস্থা তিনিই সর্ব-প্রথম করেছিলেন। যেমন, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ গোবিন্দলাল নৌকায় করে আসছেন। ছবি শেষ হলে দেখা গেল, মঞ্চের সেটে গোবিন্দলাল

গৃহে প্রবেশ করছেন। নাট্যশালাকে জনপ্রিয় করার জন্য এই রকম বহু চেষ্টা তিনি করে গেছেন। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ২৫ বছর পরে, অমরেন্দ্রনাথের মত করিৎকর্মা পুরুষকে যদি বঙ্গরঙ্গমঞ্চ না পেত, তাহলে হয়তো রঙ্গমঞ্চের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যেত।

খুব অল্পকালের মধ্যেই নট-নাট্যকার, নাট্য-নির্দেশক ও রঙ্গশালার পরিচালকরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সে যুগের বহু খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ক্লাসিক থিয়েটারে প্রায়ই সাহিত্যের আড্ডা বসত। অমরেন্দ্রনাথের রচিত নাটকগুলি নিয়ে সাম্প্রতিক কালে গবেষণা হয়েছে। নাট্য-সাহিত্যের রস-গুণের বিচারে অমরেন্দ্রনাথের নাটকগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার পরবর্তীকালে অমরেন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্য-জীবনের কার্যাবলীকে বিশ্ববিশ্রুত যোদ্ধা নেপোলিয়ানের সঙ্গে তুলনা করে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নেপোলিয়ান বলে তাকে চিহ্নিত করে গেছেন।

নটনাথের নৈষ্ঠিক পূজারী, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রাণপুরুষ অমরেন্দ্র নাথ ১৯১৬ সালে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

নটসম্রাট দানীবাবু

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে, সুদীর্ঘ ৪২ বছর কাল অভিনয় করে রঙ্গ জগতের উজ্জ্বলতম তারকারূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

দানীবাবুর জন্ম ১৮৬৮ সালে। ১৮৯০ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় শিল্পীরূপে যোগদান করেন। ১৮৯০ সালের ২৬শে জুলাই স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নাটক মঞ্চস্থ হয়। 'চণ্ড' নাটকে রঘুদেবের ভূমিকায় দানীবাবু সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম মঞ্চাবতরণেই তিনি দর্শকদের প্রশংসা লাভে ধন্য হন।

দানীবাবু গিরিশচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী প্রমদাসুন্দরীর গর্ভজাত সন্তান। দানীবাবু শৈশবেই মাতৃহারা হন। গিবিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী কৃষ্ণকিশোরী মাতৃহারা দানীকে লালনপালন করেন। পিতৃস্বসার অতিরিক্ত আদরে বাল্যে লেখাপড়ার প্রতি দানী খুবই অমনোযোগী হয়ে উঠেন। গিরিশচন্দ্র পুত্রকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু যৎসামান্য বাংলা লেখাপড়ার মধ্যেই তাঁর শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে। ছবি আঁকার প্রতি শৈশবকাল থেকেই দানীর ঝোঁক ছিল। তাই গিরিশচন্দ্র তাঁকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন। যৌবন-কৈশোরের সন্ধিকালে অঙ্কন শিল্পের প্রতিও তাঁর অনীহা দেখা দেয়। পাড়ার সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে অভিনয় শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত এই অভিনয় কলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ দেখা দেয়।

কৃষ্ণকিশোরী ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিনয়ের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে দানীকে থিয়েটারে নেবার জন্য গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সে অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়কে কৃষ্ণকিশোরী অনুরোধ জানান। অমৃতলাল দানীকে থিয়েটারের অন্যতম অভিনয়

শিল্পীরূপে গ্রহণ করার জন্য গিরিশচন্দ্রকে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র প্রতিবারই সে অনুরোধ রাখতে তাঁর আপত্তির কথা জানান। শেষ পর্যন্ত অমৃতলাল ও গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য বন্ধুদের অনুরোধে দানীকে স্টার থিয়েটারে অভিনয় শিল্পীরূপে গ্রহণ করা হয়।

এরপর পিতার শিক্ষাধীনে দানীর অভিনয়-প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক ও অপেরাধর্মী নাটকে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে কি ভাবে রূপদান করতে হয়, গিরিশচন্দ্র তা পুত্রকে শেখাতে থাকেন। পিতার শিক্ষায় পারঙ্গম হয়ে, ক্রমে একচ্ছত্র নায়করূপে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী, গিরিশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় দানীবাবু স্টার, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। দানীবাবু ২২ বছর বয়েসে সাধারণ রঙ্গালয়ে যেমন প্রবেশ করেছিলেন, তেমনি পিতার সঙ্গে ২২ বছর কাল অভিনয় করারও তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল।

অভিনয় শিল্পীকে নানা রসসৃষ্টির জন্য যা কিছু শিক্ষালাভ করার প্রয়োজন, দানীবাবু তাঁর পিতার কাছ থেকে তা শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ অভিনয়-জীবনে তিনি নানারূপ চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা দেখিয়ে গিয়েছেন। পরিণত বয়সে তাঁর অভিনয় দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, তিনি অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাগ্মী বিপিন পাল প্রভৃতি দেশবরেণ্য বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর অভিনয়-প্রতিভার স্বীকৃতি দান করে গেছেন।

বীররস, বাৎসল্যরস, ভক্তিরস সৃষ্টিতে, ক্রুর চরিত্রাভিনয়ে এবং সিরিও-কমিক চরিত্রে রূপদান করে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর অভিনীত চরিত্রে আর কেউ দর্শক-চিত্তে সে রকম রেখাপাত করতে পারেননি। আজও তাঁর অভিনীত 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য, 'দেবলা দেবী' নাটকে খিজির খাঁ, 'সিরাজ-

দৌল্লা' নাটকে সিরাজ, 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজীব, 'বঙ্গে বর্গী' নাটকে ভাস্কর পণ্ডিত, 'পথের শেষে' নাটকে দুর্গাশঙ্কর, 'বিষবৃক্ষ' নাটকে নগেন দত্ত, 'জনা' নাটকে প্রবীর, 'কারগার' নাটকে বসুদেব, 'সরলা' নাটকে গদাধরচন্দ্র এবং তাঁর শেষ জীবনে শেষ অভিনীত নাটক 'পোষ্যপুত্র'-এ শ্যামাকান্ত আজও রঙ্গজগতে কিংবদন্তী রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের রঙ্গজগতে আবির্ভাবের পর, অনেকে তাঁর অভিনয়কে **Back dated** বলে ব্যঙ্গোক্তি করলেও শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দানীবাবুর সঙ্গে শিশিরকুমার বহু নাটকে অভিনয় করেছেন।

'প্রফুল্ল' নাটকের সম্মিলিত অভিনয়ে দানীবাবু যোগেশ ও শিশিরকুমার রমেশের ভূমিকায় বহুবার অবতীর্ণ হয়েছেন। এই রকম অভিনয়ে একবার শিশিরকুমারের স্তাবকের দল শিশিরকুমারকে বলেন, "আজ দানীবাবু আপনার সঙ্গে অভিনয়ে কাৎ হয়ে পড়েছেন।" শিশিরকুমার সবিস্ময়ে তাদের দিকে চেয়ে বলেন, "বলো কি! কত বড় অভিনেতা উনি! ওঁর সঙ্গে অভিনয় করতে আজ আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।" আবার দানীবাবুর অনুরাগীরা যখন দানীবাবুকে বলেন, শিশিরবাবু আপনার পাশে আজ আর দাঁড়াতেই পারছেন না। তখন দানীবাবু তাঁদের বলেন, "ওসব কথা মুখেও এনো না। কত বড় শিক্ষিত উনি! ওঁর সঙ্গে আমার তুলনা! ভুলে যেও না অভিনয় করাটা কতকটা ব্যাট-বল খেলার মত। আদান-প্রদান ভাল হলেই অভিনয় ভাল হয়।" দুই দিক্‌পাল অভিনেতার মধ্যে এমনিই শ্রদ্ধা ভালবাসা ছিল।

১৯১৮ সালের ১৭ই আগস্ট, মনোমোহন থিয়েটারে 'দেবলা দেবী' নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৯১৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় 'দেবলা দেবী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়—"...**The play deals with the glorious past of the land of the**

heroes, and as such, it should be witnessed by all patriotic people. 'Khigir Khan' is Dani Babu and everything is said. He is the greatest actor in these days. The old age like father like son, can so nicely be applied to him. He played the part of Khigir Khan exquisitely grand…"

১৯২৪ সালে স্টার মঞ্চে, আর্ট থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে যখন ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় অভিনয় করেন, তখন দানীবাবু বার্ধক্যে উপনীত। ঐ বয়সেও তাঁর ঔরঙ্গজীবের অনবদ্য অভিনয় প্রসঙ্গে ১৯২৪ সালের ১৫ই নভেম্বর 'শিশির' পত্রিকায় লেখা হয়—

"একমাত্র দানীবাবুই আজ পর্যন্ত এই উৎকট চরিত্রের অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। দারার মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্বাক্ষর করা ও আদেশ-পত্র জিহনকে দেওয়ার দৃশ্যে যে অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়াছি, তাহার তুলনা হয় না।"

১৯৩২ সালের ১২ই মার্চ আর্ট থিয়েটার কর্তৃক স্টার রঙ্গমঞ্চে অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' (অপরেশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত) মঞ্চস্থ হয়। এই নাটক মঞ্চস্থ করার পূর্বে অপরেশচন্দ্র দানীবাবুকে শ্যামাকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য অনুরোধ জানান। এই সময়ে দানীবাবুর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তার ওপর কাগজে সেই সময় কেউ কেউ দানীবাবুকে 'শ্বেতহস্তী', 'স্থবির' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকেন। দানীবাবু কাগজওয়ালাদের বড় ভয় করতেন। তাই অপরেশচন্দ্রের অনুরোধ তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেন— "না মশাই, আমার দ্বারা আর নতুন পার্ট করা সম্ভব নয়। চোখে দেখতে পাই না। বয়সের ভারে দেহ ভেঙ্গে পড়েছে। তাছাড়া 'পথের শেষে' নাটকের দুর্গাশঙ্করের মত চরিত্র। সেখানেও বাপ ছেলে। এখানেও বাপ ছেলে। কাগজওয়ালারা গালাগালি দেবে। ও আমি পারবো না।" অপরেশচন্দ্র নানা রকম যুক্তি দেখিয়ে সম্মতি আদায় করার চেষ্টা

করলেন। কিন্তু কিছুতেই দানীবাবুকে রাজী করাতে পারলেন না শেষে অপরেশচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চাণক্যের সংলাপ আবৃত্তি করে বললেন, "ঐ অবিশ্বাসী বৌদ্ধযুগ ধরে ফেলেছে, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব যেতে বসেছে, যাবে, রাখতে পারবো না তবু যাবার পূর্বে এই কলির ব্রাহ্মণ একবার দ্বাদশ সূর্যের মত আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাবো।" আজও তো চাণক্যের এই সংলাপ আপনার মুখ থেকে শুনে, দর্শকেরা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

অপরেশচন্দ্রের কথায় দানীবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর অপরেশচন্দ্রকে বললেন—"না মশাই, আপনার সঙ্গে পারবো না। দিন পার্টটা দেখি কি করতে পারি।" অপরেশচন্দ্র পার্টটি দানীবাবুর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। এই শ্যামাকান্তই তাঁর শেষ চরিত্র-চিত্রণ। এই চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন দানীবাবু। দ্বাদশ সূর্যের মতই অভিনয় জীবনের শেষ রশ্মি বিকিরণ করে গেছেন। এই সময় 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় তাঁর শ্যামাকান্তের অভিনয় সম্পর্কে লেখা হয়—"It is indeed a treat to see that the old veteran Dani Babu in his elements again, as if he has got back his youthful fire. Age seems to have no effect upon the great actor. He reminded us of his illustrious father of the Bengali Stage."

'পোষ্যপুত্র' নাটকে তাঁর অসামান্য অভিনয় সম্পর্কে সে সময় প্রতিটি পত্রপত্রিকায় অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হয়। অভিনয়ের শেষে দানীবাবুকে দেখার জন্য দর্শকেরা থিয়েটারের গেটে অপেক্ষা করতেন। এক এক দিন এত ভীড় হতো যে সেই ভীড় ঠেলে, গাড়িতে ওঠা দানীবাবুর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠতো।

'পোষ্যপুত্র' নাটকে সপ্তবিংশতি রাত্রি অভিনয়ের পর, দানীবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৩২ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। বাংলা ১৩৪০ সালের ২রা চৈত্র 'নাচঘর'

পত্রিকায় দানীবাবু প্রসঙ্গে লেখা হয়—"সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানী-বাবুর) কথা মনে করলেই গর্ডন ক্রেগের কথা আমাদের মনে পড়ে। অভিনেতা বলতে আমরা যা বুঝি তিনি তার চেয়েও বড় ছিলেন। তিনি একটি প্রাকৃতিক শক্তি।

তিনি ছিলেন কলাবিদ, তিনি স্রষ্টা। তাঁর মত শিল্পী পৃথিবীর যে কোন জাতির গর্বের নিধি। এই জন্যই বাংলাদেশে তাঁর নাম চির-স্মরণীয় হওয়া উচিত।"

নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী

১৮৮৪ সাল। বিনোদিনীর চেষ্টায় তারাসুন্দরী স্টার থিয়েটারে অভিনয় শিল্পীরূপে যোগদানের সুযোগ পায়। তারাসুন্দরীর বয়স তখন সাত বছর। গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকে এক বালক সেজে মঞ্চে প্রবেশ করত কিশোরী তারাসুন্দরী। এই ভাবে শুরু হল তারাসুন্দরীর অভিনেত্রী জীবন। এর পর স্টার থিয়েটার ১৮৮৭ সালে যখন হাতিবাগানে নতুন গৃহনির্মাণ করে চলে আসে, তখনও তারাসুন্দরী স্টার থিয়েটারের শিল্পী-দলভুক্ত। ১৮৮৮ সালের ২৫শে মে, স্টার থিয়েটারের ন'তুন গৃহের উদ্বোধন হয় গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটক নিয়ে। এই নাটকে তারাসুন্দরী একটি ভিল বালকের ভূমিকায় অবতরণ করে। এর পর স্টার থিয়েটারে ১৮৮৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর, 'সরলা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে তারাসুন্দরী বিধুভূষণের ছেলে গোপালের ভূমিকায় অভিনয় করে। গিরিশচন্দ্র তখন এমারেল্ড থিয়েটারে নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতারূপে নিযুক্ত। কাজেই 'নসীরাম' নাটকে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। তবে মাঝে মধ্যে স্টার থিয়েটারে আসতেন। একদিন স্টার থিয়েটারের গ্রীনরুমে এসে গিরিশচন্দ্র মঞ্চ-জগতের ইষ্ট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছেন, প্রণামান্তে পেছন ফিরে দেখেন, একটি মেয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন ঃ

—তুই কে রে ?

—আমি তারা।

—তুই তো গোপাল সাজিস্ ?

—হ্যাঁ।

গিরিশচন্দ্র অমৃত মিত্রকে বলেন—"অমৃত, মেয়েটার দিকে একটু নজর রাখিস্। ওর পার্টস্ আছে।"

গিরিশচন্দ্র বালিকা তারার মধ্যে সেদিন যে শিল্পী-সত্তার পরিচয় পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা লাভ করেছিল।

কিশোরী তারা গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে যাদব, 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে রাখাল বালক, 'চণ্ড' নাটকে মুকুলজীর ভূমিকায় অভিনয় করে ধীরে ধীরে দর্শকদের কাছে পরিচিত হতে থাকে। তারাসুন্দরীর প্রথম জীবনে অমৃতলাল মিত্র ও অমৃতলাল বসুর কাছে অভিনয় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গীত শিক্ষক রামতারণ সান্যালের কাছে সঙ্গীত এবং নৃত্য-শিক্ষক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নৃত্যশিক্ষা করতে থাকে।

১৮৯১ সালে গিরিশচন্দ্র স্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করেন। এই সময় তারাসুন্দবী 'তাজ্জব ব্যাপার' নাটকে বিবি ও 'তরুবালা' নাটকে নাম-ভূমিকায় অবতরণ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। এবপব 'নরমেধ যজ্ঞ' নাটকে মুনী দত্ত, 'লায়লা মজনু' নাটকে মুন্না বাঁদী এবং 'বনবীর' নাটকে উদয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে। তারাসুন্দরীর বয়স তখন তের বছব। তারাসুন্দরীর অভিনয়-প্রতিভা দেখে, ঐ তের বছর বয়সেই তারাকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হয়।

১৮৯৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর, স্টার থিয়েটারে তারাসুন্দরীকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' নাটকের নায়িকা শৈবলিনী রূপে দেখা গেল। শৈবলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করার পর তারাসুন্দরী অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মানলাভ করেন। এই সময় তারাসুন্দরী একদিকে যেমন সুঅভিনেত্রীরূপে যশোলাভ করেছিলেন, অপর দিকে তেমনি নৃত্য-গীত পারদর্শিনী রূপেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৮৯৭ সালের ১৬ই এপ্রিল, এমারেল্ড থিয়েটার লিজ নিয়ে সে যুগের প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটারের পত্তন করেন। তারাসুন্দরী এই সময় ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন। এই সময় ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত প্রতিটি নাটকে

তারাসুন্দরী নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেন। ক্লাসিক থিয়েটারের তখন দেশজোড়া সুনাম। আর সেই সময় ক্লাসিকের মধ্যমণি তারাসুন্দরী। তাঁর সমগ্র জীবনের অভিনীত নাটকের তালিকা দীর্ঘ করে পরিচয় প্রদান করা ধৃষ্টতা মাত্র। নাট্যজগতে তারাসুন্দরী নাট্যসম্রাজ্ঞী রূপে সম্মানিত হয়েছিলেন। সত্যিই তিনি নাট্য-জগতের সম্রাজ্ঞী ছিলেন। তাঁর সমগ্র অভিনেত্রী জীবনের পরিচয় নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে অভিনয় জীবন তাঁর শুরু হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীতেও তাঁর সেই অভিনয় প্রতিভা এতটুকু ম্লান হয়নি। ১৯১২ সালে তারাসুন্দরী নাট্যজগৎ থেকে বিদায় নেন। পুত্রবিয়োগের পর তিনি মঞ্চের সংস্পর্শ ত্যাগ করে ভুবনেশ্বরে চলে যান। জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে মঠ প্রতিষ্ঠা করে, সেখানে তিনি ধর্মীয় জীবনযাপন করতে থাকেন। ১৯২৩ সালে স্টার থিয়েটারে যখন আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তারাসুন্দরীকে 'কর্ণার্জুন' নাটকে কুন্তীর ভূমিকায় অভিনয় করানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ভুবনেশ্বর থেকে তিনি ফিরে আসতে সম্মত হননি।

মানুষের জীবনটাই নাটক। বহু উত্থান-পতন এবং আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে নটনাথ মানুষকে সংসার রঙ্গমঞ্চে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ান। তাই বোধ হয় নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরীকেও ১৯২৫ সালে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অনুরোধে 'জনা' নাটকে জনার ভূমিকায়, 'রিজিয়া' নাটকে রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। অদ্যাবধি 'জনা' ও 'রিজিয়া' নাটকের নাম-ভূমিকায় এমন প্রাণস্পর্শী অভিনয় আর কেউ করতে পারেননি। ১৯২৬ সালে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে মিত্র থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তের 'শ্রীদুর্গা' নাটকে তারাসুন্দরী শ্রীদুর্গার ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেন। সেই সময়কার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তারাসুন্দরীর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে

নানারূপ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। অস্তমিত সূর্যের বর্ণচ্ছটায় তাঁর শেষ অভিনয় আজও মঞ্চের মানুষদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

দেশবরেণ্য নেতা, বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ১৯১৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে 'দি হিন্দু রিভিউ' পত্রিকায় 'দি বেঙ্গলী স্টেজ' নামক প্রবন্ধে তারাসুন্দরী সম্পর্কে লেখেন—" * * * But not merely in the refinement and delicacy of their deportment on the stage, but equally also in the quality of their art some of our actresses could well hold their own in competition with the best representatives of the English stage· Those who have seen part of Reziya as it is played by Sreemati Tarasundaree, will bear out the truth of this statement. Reziya's is one of the most complex characters met with in any literature. Shakespeare's Lady Macbeth comes very close to it. But even Lady Macbeth is possibly a shade simpler than Reziya. And Tara's rendering of Reziya has been declared by competent critics, who have seen the best European actresses, to be as good an achievement as the best rendering of Lady Macbeth by the most capable of English actresses * * * "

তারাসুন্দরী যে কত বড় অভিনেত্রী ছিলেন, তা বিপিনচন্দ্রের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই প্রমাণিত হয়। সাত বছর বয়সে যাঁর অভিনেত্রী জীবন শুরু হয়েছিল, তাঁর পক্ষে লেখাপড়া করার যে কোন সুযোগ হয়নি, এ কথা অবিসংবাদিত সত্য। কিন্তু এ সত্য যখন মিথ্যা বলে মনে হয়, তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। নাটকের ভাষা আয়ত্ত করতে করতে নিজেরই অজ্ঞাতসারে, যেদিন তাঁর মনের মণি-কোঠায় কবি-মনটি ধরা দিল, সেদিন তিনি আর তাকে অন্তরের মাঝে

আবদ্ধ করে রাখতে পারলেন না। তাঁর দ্বিতীয় সত্তার আবির্ভাব হল। নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী হলেন কবি তারাসুন্দরী। তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যা খুব বেশী না হলেও, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ভাবের সঙ্গে ভাষা এবং ছন্দের সঙ্গে বিষয়ের সামঞ্জস্য রেখেই তিনি কবিতাগুলি রচনা করে গেছেন।

গিরিশচন্দ্র সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকার ১৩০২ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় দু'টি কবিতা প্রকাশিত হয়। এতদ্ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখেন—"সভ্য সমাজে আমার স্থান আছে কিনা জানি না। জানিতেও চাহি না। কারণ যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতে রঙ্গভূমির উন্নতি-উদ্দেশ্যে দৃঢ়-সংকল্প লইয়া জনসাধারণের উপেক্ষার পাত্র হইয়া আছি। সে যাহা হউক, অভিনেতৃবর্গ আমার চক্ষে পুত্র-কন্যার মত সন্দেহ নাই। তাহাদের গুণগ্রাম অপ্রকাশিত থাক, আমার ইচ্ছা নয়। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কবিতা দুইটি প্রকাশ করিলাম।"

প্রথম কবিতাটি নটী বিনোদিনীর। দ্বিতীয় কবিতাটি তারাসুন্দরীর। তারাসুন্দরীর কবিতাটির নাম "প্রবাহের রূপান্তর"।

"শ্মশান জীবনমম, নন্দন কাননসম,
পাপস্মৃতি দূরে গেছে, ফুটেছে নয়ন।
জীবনের গুরুভার, কাতর না করে আর
কে আমার? ঘুচাইল ভ্রম আচ্ছাদন॥
ক্ষুদ্রমতি নারীপ্রাণ, অর্থ, আশা, অভিমান,
কালের কুটিল স্রোতে হয়ে দিশেহারা।
অন্ধকার আলিঙ্গন, করিয়াছি আজীবন
প্রলোভনে সঁপি মন, হইয়াছি সারা॥
সরল আশ্রয় করে, প্রাণের আবেগভরে,
ধরিতে গিয়েছি যারে, সে নয় আমার।
হাসিমুখে ঠেলে পায়, অন্ধ মন তারে চায়,
পরিণামে ওঠে শুধু, শ্রান্ত হাহাকার॥

সহোদর, সহোদরা, প্রাণের সঙ্গিনী যারা,
স্বার্থের ছলনে ভুলি, করে আত্মবলি।
ভালবাসি যদি কারে, নানা কথা কয় তারে,
কাতরে হৃদয়-ভারে, দিবানিশি জ্বলি ॥
এ কথা বুঝিবে কে রে ? দুহিতায় ছুরি মেরে,
মাতা করে অন্বেষণ, সুখ আপনার।
ছাই-এ হৃদয়পুর, যাক ভেঙ্গে হ'ক চুর,
আকিঞ্চন স্বার্থসিদ্ধি, মূলমন্ত্র তার ॥
পরমায়ু যত ক্ষয়, সুখ আশা তত হয়,
বার্ধক্যের সনে বাড়ে, লালসা জীবনে।
পরকাল চিন্তা হায়, অসার স্বপন প্রায়,
ছুটে যায় একেবারে, ছায়া নাই মনে ॥
ভবিষ্যৎ বিভীষিকা, প্রেতময়ী মরীচিকা,
প্রতিকৃতি যদি তার, মিলেছে আমার।
যৌবন প্রবৃত্তি যত, সৌরভে করিবে রত,
পরিমল পবিত্রতা, কর অনুসার।

কবিতাটির মধ্য দিয়ে অভিনেত্রী জীবনের ক্লেদ ও অন্তর্দাহ ফুটে উঠেছে। ত্রিপদী ছন্দের মাধ্যমে যে ভাব তিনি প্রকাশ করেছেন, তা শুধু হৃদয়গ্রাহীই হয়নি, বলা যেতে পারে, সত্যের মুখোমুখি হয়ে তিনি অন্তরের কথা প্রকাশ করেছেন।

'সৌরভে'র ভাদ্র সংখ্যাতেও তারাসুন্দরীর 'কুসুম ও ভ্রমর' নামে আর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এ কবিতাটিতেও তিনি অসঙ্কোচে পঙ্কিল জীবনের চিত্রটি 'তুলে ধরেছেন—

(১)

মিলায়ে কমল কায়, প্রকৃতির কোলে,
ছানিত মাধুরী হরি, ধরায় কি ভাব ধরি,

আনিল চুমিয়া কূল, মৃদু মৃদু দোলে।
কাঁটায় ভোরেছে গায়, তবু মন ভোলে?

(২)

প্রেম আসে, আসে যায়, প্রেমিক ভ্রমর?
অনাদর নাহি করে, সমাদর যারে তারে,
মধু খায়, সুখে বসে—বুকের উপর।
বোঝা দায়, কে তোমার আপনার পর।

(৩)

নারীর যৌবন সম, গরব তোমার।
যতদিন মধু রবে, আদরের ধন হবে,
অবহেলে বিলাইলে, মান আপনার।
না বুঝিলে ছলনা এ কুটিল ধরার।

(৪)

সুবাস ধরেছ বুকে, কি হেতু ছড়াও?
গুণের গরিমা নাই, অযতনে বুঝি তাই,
সাধের সৌরভ হায়! অবাধে লুটাও।
বিকৃতি প্রকৃতি লয়ে কিবা সুখ পাও?

(৫)

বিচিত্র চরিত্রে মুগ্ধ, অন্তর আমার।
খেলিয়ে পবন মনে, সুমধুর আবাহনে,
পরাগ ছড়ায়ে মোরে ডে'ক না'ক আর—
অণুমাত্র প'ড়ে আছি ধরে এ সংসার।

অভিনেত্রী তারাসুন্দরীকে মঞ্চাভিনয়ে যেমন বহু নায়কের সঙ্গে হাসি-কান্না-মিলন-বিরহের অভিনয় করতে হয়েছে, সংসার-মঞ্চেও তাঁকে তেমনি বহু নায়কের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। মঞ্চাভিনয়ে তিনি পেয়েছিলেন অজস্র প্রশংসা আর-অভিনন্দন। কিন্তু সংসার-জীবন তাঁর ভরে উঠেছিল হতাশা আর বঞ্চনায়।

তারাসুন্দরীর জন্ম ১৮৭৮ সালে। মৃত্যু ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৮ সালে। সুদীর্ঘ ৭০ বৎসরের গৌরবময় অভিনেত্রী জীবনের কাহিনী, বঙ্গরঙ্গালয়ের শতাধিক বৎসরের ইতিহাসের অনেকখানি জুড়ে আছেন নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী। আর সেই সঙ্গে কবি তারাসুন্দরীর কিছু কবিতা ও গান সে যুগের কোনো কোনো পত্র-পত্রিকায় ইতঃস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। শোনা যায়, ভুবনেশ্বরবাসিনী তারাসুন্দরীর কন্যা প্রতিভাদেবীর কাছে তাঁর অপ্রকাশিত কিছু কবিতা ও গানের পাণ্ডুলিপি আছে। সেগুলি সংগ্রহ করতে পারলে মঞ্চ-নায়িকার সাহিত্য-কীর্তির আরো কিছু পরিচয় হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

নটী-কুলমণি কুসুমকুমারী

নাট্যশালার গোড়ার যুগে কুসুম নামে অনেকগুলি অভিনেত্রী ছিল। তাই কারুর নামের পাশে কুসুম (প্রহ্লাদ), কুসুম (বিষাদ), কুসুম (নিশা) ইত্যাদি লেখা হত। আর এক কুসুম, যিনি নাট্য-জগতে তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন, তাঁর নামের পাশে কিছুই লেখা হত না ; তিনি কুসুমকুমারী নামেই পরিচিতা হয়ে

[illegible]

তিনি নাচে-গানে পারদর্শিনী হয়ে উঠেছিলেন। সেকালের রেওয়াজ অনুসারে সখীর দলে নাচ-গান করে, ধাপে ধাপে অভিনেত্রীর মর্যাদা-লাভ করতে হত। কিন্তু কুসুমকুমারী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। কোন দিনই তাঁকে সখীর দলে নাচতে হয়নি। গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দু-শেখরের কাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমেই তিনি 'ম্যাকবেথ' নাটকে ফ্লিয়েন্সের ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেছিলেন। 'মিনার্ভা' থিয়েটারে ১৮৯৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী 'ম্যাকবেথ' মঞ্চস্থ হয়। ফ্লিয়েন্সের ভূমিকায় মোটামুটি তিনি ভালই অভিনয় করেন। ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি 'মিনার্ভা' থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি 'মুকুল-মুঞ্জরা', 'আবুহোসেন', 'স্বপ্নের ফুল' 'করমেতিবাঈ', 'প্রফুল্ল', 'ফণির মণি' প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করে সুনাম অর্জন করেন।

১৮৯৭ সালের ১৬ই এপ্রিল মঞ্চ-জগতের অন্যতম দিক্‌পাল নট-

নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 'ক্লাসিক' থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে কুসুমকুমারী ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন। ক্লাসিকের প্রচারপত্রে কুসুমের নামের পাশে লেখা হয়েছিল …"The Jewel of Minerva Theatre." ১৮৯৭ সালের ২০শে নভেম্বর, ক্লাসিক থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' নাটক মঞ্চস্থ হলো। মর্জিনার ভূমিকায় নাচে-গানে-অভিনয়ে তিনি এমন দক্ষতার পরিচয় দিলেন যে, রাতারাতি প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর যোগ্যতা অর্জন করলেন। সাধারণত যাঁরা নাচে-গানে পারদর্শিনী হতেন, তাঁদের অভিনয় ক্ষমতা ততটা থাকত না। কিন্তু কুসুমকুমারীর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতাও ছিল। বলা যেতে পারে, নট-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্তের শিক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীরূপে পরিচিতা হয়ে উঠেছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে থাকাকালীন তিনি বহু নাটকে যোগ্যতার সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ১৮৯৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'ভ্রমর' নামে মঞ্চস্থ হয়। ক্লাসিক থিয়েটারের 'ভ্রমর' সে যুগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। নায়িকা ভ্রমরের ভূমিকায় অভিনয় করে কুসুমকুমারী শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মানলাভ করেন। ১৮৯৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর, 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়—"Thc role of Bhramar is one, which is difficult of stage representation. The story covers a period of several years during which Bhramar grows from a playful kitten into a responsible wife. The earlier portion of her life is one of loving, ingenuousness, and not of conscious archness, such as is exhibited by the interpreter. The transition into graver mood, however, is in the care of the player, an artistic achievement." মর্মস্পর্শী অভিনয়ে কুসুমকুমারী দর্শকদের কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে,

তিনি শুধু নৃত্যগীত-পটিয়সী অভিনেত্রী নন, সবরকম চরিত্রাভিনয়ে তিনি পারদর্শিনী।

ক্লাসিক থিয়েটার যখন সুনাম ও সুযশের শীর্ষে, কুসুমকুমারী তখন ক্লাসিকের মধ্যমণি।

তাঁর যে অভিনয়-জীবন শুরু হয়েছিল ১৮৯৩ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে, তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৯৩৩ সালে নাট্যনিকেতনে। সুদীর্ঘ চার দশকের ঊর্ধ্বকাল তাঁর যে কর্মজীবন, সে জীবনে তিনি বাংলার প্রতিটি সাধারণ রঙ্গালয়ে কোন না কোন সময়ে অভিনয় করেছেন। বহু অপেরাধর্মী নাটক তিনি নাচে-গানে যেমন মাতিয়ে তুলেছিলেন, তেমনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকেও তিনি বহু কঠিন ভূমিকায় রূপদান করে গেছেন। আর্ট থিয়েটার পরিচালিত স্টার থিয়েটারে ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর, অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নাটক মঞ্চস্থ হয়। .শেষ জীবনে কুসুমকুমারী এই ভক্তিমূলক নাটকে শচীদেবীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রথমে পুত্রের জন্য ব্যাকুলতা এবং শেষে নিমাইকে সন্ন্যাস-জীবনে প্রবেশে সম্মতি দান—এই দ্বৈতসত্তার প্রকাশে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৯৩৩ সালের পর তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য ও জীর্ণদেহ নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। শেষ জীবনে সুদীর্ঘ পনের বৎসর কাল তাঁর অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। নিজের বাসগৃহটিও বিক্রয় হয়ে যায়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিও হারান। পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে তাঁকে দিনাতিপাত করতে হয়েছে।

১৯৪৫ সালে ছিন্নমলিন বেশে, একটি কিশোরের কাঁধে হাত দিয়ে, 'রঙ্‌মহল' থিয়েটারে আমি তাঁকে আসতে দেখেছি। সে সময় রঙ্‌মহল থিয়েটারের মালিক ছিলেন অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের ঘরে রঙ্‌মহলের পরবর্তী নাটক সম্পর্কে আলোচনা করছি, এমন সময় তিনি প্রবেশ করলেন। শরৎচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে, 'আসুন মা! আসুন' বলে সসম্মানে তাঁকে পাশের চেয়ারে বসালেন। তারপর

টেবিলের ড্রয়ার খুলে, কিছু টাকা তাঁর হাতের মুঠোয় তুলে দিলেন। অস্ফুটে একটি মাত্র কথাই আমার কানে গেল—'বেঁচে থাকো বাবা।' ইতিমধ্যে থিয়েটারের চাকরকে ডেকে শরৎচন্দ্র বললেন—'মাকে গ্রীন-রুমে নিয়ে যা।' কিশোর ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে, চাকরের সঙ্গে ধীরে ধীরে গ্রীনরুমের দিকে চলে গেলেন কুসুমকুমারী, শিল্পীদের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশায়। আর্ট থিয়েটারে ও নাট্যনিকেতনে ইতিপূর্বে তাঁর অভিনয় দেখলেও সেদিন কিন্তু আমি তাঁকে মোটেই চিনতে পারিনি। সবিস্ময়ে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়েছিলাম। শরৎচন্দ্র বললেন—'তুমি ওঁকে চিনতে পারলে না? উনি যে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের মর্জিনা!'

মর্জিনার দুঃখে সত্যিই সেদিন আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ২৯শে নভেম্বর, মর্জিনা সংসার রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। জানি না, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় তিনি পৃথিবীকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন কিনা—'ছিঃ ছিঃ, এত্তা জঞ্জাল!'

সুধাকণ্ঠী সুশীলাবালা

'Prima donna Nightingale' খ্যাতা সে যুগের সঙ্গীতে ও অভিনয়ে পারদর্শিনী সুশীলাবালার কথা, আজকের নাট্যামোদী মানুষেরা অনেকেই হয়তো জানেন না। অথচ সে যুগের দর্শকরা ছিলেন তাঁর একান্ত অনুরাগী। তাঁর অকাল-বিয়োগে দর্শকদের মধ্য থেকে অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে কবিতা লিখে, সেই মুদ্রিত কবিতা নাট্যামোদী দর্শকদের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিলি করেছিলেন। এমনতর সুদীর্ঘ এক কবিতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। এ থেকে বোঝা যায়, কি অসাধারণ জনপ্রিয়তা তিনি তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনে লাভ করেছিলেন।

"বাঙালীর চির সাধের সুশীলা নাট্যশালার উজল মণি,
গেছে চলি 'আজি আমাদের ছাড়ি' হাজার সুরের অতল খনি।
ইন্দ্রধনুর বর্ণের মত সুর খেলাইত কণ্ঠে যার,
সে মধুর ধ্বনি শুনিয়া যাহার কোকিল মানিত হার।"

কোকিলকেও যিনি হার মানিয়ে, সুধাশ্রবী কণ্ঠের গান শুনিয়ে, দর্শকচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছেন, যার ফলে দর্শক সমাজ থেকে কাব্য রচিত হয়েছে ; জন্মসূত্রে তিনি সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হলেও, কর্ম-সূত্রে তিনি মহিমময়ী।

সুশীলাবালা ১৮৮৪ সালে এক অজ্ঞাতকুলশীল ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঝামাপুকুর এ. এম্‌, গার্লস্‌ স্কুল থেকে মধ্য বাংলা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। তখন তাঁর বয়েস মাত্র দশ বছর। এই দশ বছরের মেয়েটি ভালভাবে পাস করেও অর্থের অভাবে আর পড়াশোনা করতে পারেননি। ছোটবেলা থেকে তাঁর গানের গলাটি ছিল ভারী মিষ্টি। স্কুল ত্যাগ করার পর, তিনি কারুর কাছে গান শিখেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে দশ বছর বয়েস থেকে দীর্ঘ ন'বছর তিনি

বাড়িতেই কাটিয়েছেন।

১৮৯৩ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলে, সুশীলাবালা এই থিয়েটারে শিক্ষানবিস শিল্পীরূপে যোগদান করেন। কিছুদিন মিনার্ভা থিয়েটারে থাকার পর, মেছুয়াবাজারের বীণা থিয়েটারে 'গেইটি থিয়েটার' নামে এক থিয়েটারের আবির্ভাব হয়। এই গেইটি থিয়েটারেও বিনা বেতনে সুশীলাবালা যোগদান করেন। এখানে গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' নাটকে হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় তিনি এমন প্রাণস্পর্শী অভিনয় করেন যে, থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাঁর মাস-মাইনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই গেইটি থিয়েটার উঠে যায়। এই সময়ে চোরবাগানে 'এম্প্রেস থিয়েটার' নামে একটা প্রাইভেট থিয়েটার পার্টি ছিল। সুশীলাবালা সেই দলে যোগদান করেন। অর্ধেন্দুশেখর এই দলের নাট্য-শিক্ষক ছিলেন। সুশীলাবালা তাঁর শিক্ষার গুণে অভিনয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। এখানে অভিনয় করার সময় সে যুগের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয় এবং তাঁর সাহায্যে গিবিশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন। গিরিশচন্দ্র যখন রামপুর বোয়ালিয়ায় অভিনয় করতে যান, তিনি তখন তার দলভুক্ত শিল্পীরূপে অভিনয় করেন। এর পর অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন। ক্লাসিক থিয়েটারে তখন সে যুগের অনেকগুলি নামকরা অভিনেত্রী ছিলেন। কাজেই সুশীলা সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা পাননি। তাই অভিনয়ে তাঁর দক্ষতা দেখানোর সুযোগও সেখানে হয়নি।

নাগেন্দ্রভূষণ মিনার্ভা থিয়েটার বেশিদিন চালাতে পারেননি। পাঁচ বছরের মধ্যেই ১৮৯৩ সালের ৩১শে মার্চ মিনার্ভা থিয়েটার প্রকাশ্য নালামে বিক্রি হয়ে যায়। এরই মাঝে কেউ কেউ এসে মিনার্ভা চালু করেন। কিন্তু কেউই বেশিদিম থিয়েটার চালাতে পারেননি। শেষে শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালনার

দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথ যে বয়সে থিয়েটার চালাতে এলেন, তখনও কিন্তু তিনি সাবালক হননি। ঐ বয়সে অভিনয় শিল্পকলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মে। এ ছাড়া নাট্য-রচনাতেও তিনি মনোনিবেশ করেন। ১৮৯৯ সালের ২৭শে মে তিনি মিনার্ভা থিয়েটার চালু করলেন। কিন্তু নীলামে মিনার্ভা থিয়েটার প্রথমে যাঁরা কিনে-ছিলেন, তাঁরাও প্রচুর ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই মিনার্ভা থিয়েটার দ্বিতীয়বার হাইকোর্টে নীলামে উঠলো। নরেন্দ্রনাথ তখন নাবালক, কাজেই তাঁর পক্ষে নীলাম ডাকা সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার ও তাঁর সহকারী বেণীভূষণ রায় ও অতুলচন্দ্র রায়ের নামে মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়িটি কিনে নেন। পরে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হলে, থিয়েটারটি নিজের নামে করে নেন।

নরেন্দ্রনাথকে অল্প বয়সে থিয়েটারের নেশা যেমন পেয়ে বসেছিল, তেমনি সুশীলাবালার মধুর কণ্ঠের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সুশীলাবালাকে কাছে পাবারও তাঁর কম আগ্রহ ছিল না। তাই সুশীলাবালাকে প্রধানা অভিনেত্রী করে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে এলেন। নরেন্দ্রনাথের পরিচালিত নাটক দুর্গাদাস দে রচিত 'শ্রী'। নায়িকা 'শ্রী'-র ভূমিকায় অবতীর্ণা হলেন সুশীলাবালা। এরপর নরেন্দ্র-নাথের রচিত 'মদালসা' মঞ্চস্থ হলো ১৮৯৯ সালের ১২ই আগস্ট। নাম-ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন সুশীলাবালা। এর পরে ঐ একই বছরে আরো দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৯০০ সালের ১০ই মার্চ, রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণে'র নাট্যরূপ মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হলো। সুশীলাবালা জেলেখার ভূমিকায় গানে ও অভিনয়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করলেন। 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা'—এই গানটি সুশীলাবালা যখন গাইতেন, তখন দর্শকেরা অশ্রু বিসর্জন করতেন। অনেকে বলেন—'সুশীলাবালার মত জেলেখার ভূমিকায় আজ পর্যন্ত কেউ অভিনয় করতে পারেননি।'

'মাধবীকঙ্কণ' দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করলেও আশানুরূপ অর্থাগম

হলো না। নরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটার থেকে গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভায় অধ্যক্ষ করে নিয়ে এলেন। ১৯০০ সালের ২৩শে জুন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' নাটকায়িত করে, গিরিশচন্দ্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হলো। এ নাটকের ভূমিকালিপিতে নামভূমিকায় ছিলেন গিরিশচন্দ্র, গঙ্গারাম —দানীবাবু, শ্রী—তিনকড়ি, জয়ন্তী—সুশীলাবালা। জয়ন্তীর ভূমিকায় গানে ও অভিনয়ে সুশীলাবালা রঙ্গজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। তিনি যখন গাইতেন—'উদার অম্বরশূন্য সাগর, শূন্যে মিলাও প্রাণ', তখন তাঁর সুমধুর সঙ্গীতে অভিভূত হয়ে যেতেন দর্শকেরা। সঙ্গীতে ও অভিনয়ে সুশীলাবালা রঙ্গজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও, নরেন্দ্রনাথ কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারের মালিকানা বজায় রাখতে পারলেন না। ১৯০১ সালে দেনার দায়ে নরেন্দ্রনাথ ইন্‌সল্‌ভেন্সি ফাইল করলেন। নরেন্দ্রনাথ সুশীলাবালাকে নিয়ে তখন ঘর বেঁধেছেন। দর্শকদের চোখের আড়াল হলেন নরেন্দ্রনাথ আর সুশীলাবালা। সংসার জীবনযাপন করতে লাগলেন। নাট্যজগতে সুশীলার তখন খুব নামডাক। থিয়েটারের মালিকেরা তাঁদের নিজ নিজ দলে সুশীলাবালাকে নেওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছাড়া সুশীলাবালা কোন দলভুক্ত হতে চাইলেন না। অথচ কোন থিয়েটারের মালিকই নরেন্দ্রনাথকে নিতে চাইলেন না। বাধ্য হয়ে সুশীলাবালা সংসারেই আবদ্ধ হয়ে রইলেন। এইভাবে প্রায় দু-বছর মঞ্চ-হারা হয়ে ঘরে বসে রইলেন সুশীলাবালা। জমিদার পুত্র নরেন্দ্রনাথ তখম সর্বস্বান্ত। ঋণভারে জর্জরিত। সংসার প্রায় অচল। শেষে বাধ্য হয়ে ইউনিক থিয়েটারে সুশীলাবালা যোগদান করলেন। ১৯০৩ সালের ৬ই জুন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রত্নমালা' নাটকে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ইউনিক থিয়েটারের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে মনান্তর দেখা দেওয়ায়, সুশীলা-বালা ইউনিক থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করলেন।

এর-পর বছর দুই অন্য থিয়েটারে কাজ করার পরে সুশীলাবালা মিনার্ভা থিয়েটারে পুনরায় যোগদান করেন। মাসিক ৭০ টাকা

বেতনে সেখানে যোগদান করে, নিজের কৃতিত্বে সেই বেতন বর্ধিত হয় মাসিক ১০০ টাকায়। এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটক ১৯০৫ সালের ৮ই এপ্রিল মঞ্চস্থ হয়। সুশীলাবালা জোবির চরিত্রে অভিনয়ে ও গানে অসামান্য রূপদান করেন। তাঁর কণ্ঠে 'উলু নয় ও রোদন ধ্বনি' গানটি শুনে দর্শকেরা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতেন। এই সময়ে মিনার্ভায় অভিনীত গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিটি নাটকে, সঙ্গীত বহুল বিশিষ্ট চরিত্রে সুশীলাবালা রূপদান করেছেন। বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের গান সুশীলাবালার কণ্ঠে শোনার জন্য দর্শকেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। সুশীলাবালা যখন মিনার্ভা থিয়েটারের স্বনাম-খ্যাতা অভিনেত্রীদের অন্যতমা, সেই সময়ে ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ সুশীলাবালাকে ১০০০ টাকা বোনাস ও ১২০ টাকা মাসিক বেতনে একটি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে তাঁদের দলভুক্ত করে নেন। মনোমোহন পাঁড়ে তখন মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক ও মহেন্দ্রকুমার মিত্র অন্যতম অংশীদার। তাঁরা সুশীলাবালার ন্যাশনাল থিয়েটারের চুক্তির কথা জানতে পেরে বিচলিত হয়ে ওঠেন। মহেন্দ্রকুমার মিত্র সুশীলাবালাকে বুঝিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন এবং ১০০০ টাকা বোনাস ও ১১০ টাকা মাসিক বেতনে মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে তিন বছরের জন্য এক নতুন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করান। উত্তরকালে এই চুক্তিপত্রকে কেন্দ্র করে সুশীলাবালার জীবনে এক বিপর্যয় নেমে আসে। চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করার পর, মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ তাঁকে অধিকাংশ নাটকে অভিনয় করার বিশেষ কোন সুযোগ দেন না। ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার আগে, মিনার্ভা কর্তৃপক্ষকে না জানানোর জন্য, তাঁরা যে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন, সুশীলাবালা তা বুঝতে পারেন। তাই অভিমানের বশে সুশীলাবালা ১৯০৭ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মনোমোহন পাঁড়েকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখে জানান যে, তিনি মিনার্ভায় কাজ করতে অনিচ্ছুক। এবং পত্রের শেষে লেখেন—"…সবিশেষ বক্তব্য, আপনাদের

প্রদত্ত এক হাজার টাকা বোনাস আমি ফেরৎ দিতে প্রস্তুত আছি। অনুগ্রহপূর্বক লোক প্রেরণ করিলে আমি উক্ত বোনাস ফেরৎ দিব। আমার এই ত্যাগপত্র মঞ্জুর করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিবেন। ইতি শ্রীমতী সুশীলাবালা দাসী, সন ১৩১৮ সাল, তারিখ ৬ই আশ্বিন।"

এই পত্র পাওয়া মাত্র মনোমোহন বাবু ও মহেন্দ্রবাবু একদিকে চিন্তিত ও অপরদিকে সুশীলাবালার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। চিন্তার কারণ হলো ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁরা চিঠি পেলেন, অথচ ২৫শে তারিখে দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে সুশীলাবালা মেহেরের ভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। আর ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোন্ সাহসে সুশীলাবালা কার্যত্যাগ করতে চান? কোনো সূত্রে এর আগে মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ খবর পেয়েছিলেন যে সুশীলাবালার সঙ্গে কোহিনূর থিয়েটারের মৌখিক কথাবার্তা চলছে। তাই মনোমোহনবাবু হাইকোর্টে সুশীলা-বালার নামে মামলা রুজু করলেন ও তাঁর বিরুদ্ধে ইনজাংশন জারি করলেন। আর সেই সঙ্গে ১০,০০০ টাকার খেসারতও দাবী করলেন। চুক্তিভঙ্গের অপরাধে সুশীলাবালার বিরুদ্ধে ডিক্রি হলো। সুশীলা বিচারপতি ম্যাকলীন এবং বিচারপতি হ্যারিংটনের আদালতে আপীল করলেন। আপীলে পূর্ব আদেশ বহাল রইলো। শেষ পর্যন্ত সুশীলাকে মিনার্ভায় পুনরায় কাজে যোগদান করতে হলো। ইতিমধ্যে মিনার্ভায় অভিনীত বিভিন্ন নাটকে সুঅভিনয় করে সুশীলাবালা খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। যাই হোক, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলিন' নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করার পর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। তিনি মিনার্ভার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করেন।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন বেঙ্গল স্টেজ ভাড়া নিয়ে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার খোলার তোড়জোড় করছিলেন। তিনি সুশীলাকে ৩০০০ টাকা বোনাস দিয়ে, তাঁর দলভুক্ত করে নেন। গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয় শুরু হয় ১৯১১ সালের ১৭ই জুন এবং এখানে অমরেন্দ্রনাথ সম্প্রদায়ের

অভিনয় শেষ হয় ১০ই অক্টোবর। মোট পাঁচ মাস এখানে অভিনয় করে স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অমরেন্দ্রনাথ লেসীরূপে তাঁর দল নিয়ে স্টার থিয়েটারে অভিনয় শুরু করেন। সুশীলাবালা স্টারে এসে বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র চিত্রণে তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

এই সময়ে সুশীলাবালা সন্তানসম্ভবা হওয়ায় ১৯১৪ সালের ১লা জুলাই থেকে ছুটি নেন। সুশীলাবালার বয়স তখন ত্রিশ বছর। বেশি বয়সে সন্তানসম্ভবা হওয়ায় তাঁর দেহে নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত একটি মৃত সন্তান প্রসব করে সূতিকা রোগে তিনি আক্রান্ত হলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই তিনি স্টারের অভিনয় আসরে নিয়মিত অভিনয় করতে শুরু করেন। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বেশিদিন অভিনয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। পুনরায় রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়িনী হয়ে পড়েন। ১৯১৫ সালের ৩রা জানুয়ারী, রবিবার, শেষ রাত্রে তিনি সংসার রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের মধ্যে তিনি তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য কিম্বদন্তী হয়ে আছেন। বহু প্রলোভনের সম্মুখীন তিনি হয়েছেন, কিন্তু ঘৃণা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোনো রকম অশালীন কথা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর মার্জিত রুচিবোধের জন্য সকলেই তাঁকে সম্ভ্রম করে চলত। তিনি জীবন-সঙ্গীরূপে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের দুর্দিনে তাঁকে সাহায্য করেছেন। নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর যে ঐকান্তিক ভালবাসা ছিল, তা আজও গল্পকথায় পর্যবসিত হয়ে আছে। সুশীলাবালার অনুপম চরিত্র-মাধুর্য দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল 'পরপারে' নাটকে শান্তার চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। 'পরপারে' নাটকের শান্তা কল্পনার নয়—বাস্তবের সুশীলাবালা।

নৃত্যকলাকুশলী নৃপেন্দ্রচন্দ্র

নাট্যজগতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু 'নেপা বোস' নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। নাচে, গানে ও অভিনয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র সমান পারদর্শী ছিলেন। অভিনয়-শিল্পীরূপে একাধারে এই তিনটি গুণের সমাবেশ এ যাবৎ খুব অল্পসংখ্যক শিল্পীর জীবনে দেখা গেছে। যদিও কোনো কোনো শিল্পীর মধ্যে এই তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটেছে কিন্তু নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মত সৃজনী শক্তি অন্য কোনো শিল্পীর মধ্যে আজও দেখা যায়নি। নৃপেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন জাতশিল্পী। নাট্যশালার ইতিহাসে তিনি তাঁর সৃজনী প্রতিভায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন হোগলকুড়িয়া নিবাসী হরিশচন্দ্র বসুর অষ্টম সন্তান। ইং ১৮৬৭, বাং ১৪ই আশ্বিন, ১২৭৪ সালের মহাষ্টমীর দিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রজীবন শুরু হয় জগবন্ধু মোদকের বাংলা স্কুলে। পরে বেঙ্গল একাডেমী ও মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষা-লাভ করেন। জগবন্ধু মোদকের স্কুলে পড়ার সময়ে পরীক্ষায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করায় তিনবার পুরস্কারলাভ করেন। কিন্তু অভিনয় শিল্পকলার প্রতি গভীর অনুরাগবশতঃ তিনি লেখাপড়ায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

সেকালের খ্যাতকীর্তি নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। অমরেন্দ্রনাথের কাঁকুড়গাছির বাগানবাড়ির আড্ডায়, তিনি সে যুগের সর্বজনস্নেহধন্যা অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর কাছে নৃত্যশিক্ষা লাভ করেন। এই নাচের রূপরীতির পরিবর্তন করা নিয়ে তিনি সারাজীবন গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। নৃত্যকলাকুশলতায় তিনি আজও প্রবাদপুরুষরূপে রঙ্গজগতে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাধীনে ১৮৯৫ সালে ২৮ বছর বয়সে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'ফণীর মণি' নাটকে ফকরের ভূমিকায় সর্বপ্রথম

আত্মপ্রকাশ করেন। মিনার্ভা থিয়েটারে বছর তুই বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করার পর, ১৮৯৭ সালে তাঁর বন্ধু অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন। ক্লাসিকে যোগদানের পর, ২০শে নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে নৃত্য-পরিচালনা তথা আবদাল্লার ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। শুধু সে যুগে নয়, এ যুগে আজও 'আলিবাবা' নাটকের প্রসঙ্গে নেপা বোসের আবদাল্লার অভিনয়ের কথা উচ্চারিত হয়ে থাকে। মর্জিনার ভূমিকায় অভিনয় করতেন নৃত্যগীত পটীয়সী কুসুমকুমারী। নেপা বোস ও কুসুমকুমারী নাচে, গানে ও সার্থক অভিনয়ের দ্বারা ক্ষীরোদপ্রসাদের অপেরাধর্মী 'আলিবাবা' নাটকটিকে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে রেখেছে।

'আলিবাবা' নাটক মঞ্চস্থ করার পূর্বে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটারের পরিচালনার ব্যাপারে আর্থিক কৃচ্ছ্রতার সম্মুখীন হয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। 'আলিবাবা' নাটক মঞ্চস্থ করার পর, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রচুর অর্থাগম হতে থাকে। একাধারে অর্থ ও প্রশংসার জয়মাল্যে ভূষিত হয়ে ক্লাসিক থিয়েটার তখন অন্যান্য থিয়েটারের শীর্ষস্থান অধিকার করে।

শ্রীরমাপতি দত্ত তাঁর 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ১৫৮ পৃষ্ঠায় এক জায়গায় লিখেছেন—"নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের নিকট আলিবাবার পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। তৎকালীন বঙ্গদেশে এমন কোন লোক ছিলেন না, যিনি আলিবাবার নাম শোনেন নাই বা তাঁহার অভিনয় দর্শন করেন নাই। এই গীতিনাট্যের অভিনয় হইতে ক্লাসিক থিয়েটারের তথা অমরেন্দ্রনাথের ভাগ্য পরিবর্তন হইয়া গেল। এক আলিবাবা হইতে তিনি লক্ষাধিক মুদ্রায় লাভবান হইলেন।" ঐ গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠায় 'আলিবাবা'র নৃত্য প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন—'আলিবাবা' নৃত্যকে নূতনত্বে মণ্ডিত করিল।" প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে

পারে, থিয়েটারী নাচের যে ঢং ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল, 'আলিবাবা' নাটকে নৃপেন্দ্রচন্দ্র তার আমূল পরিবর্তন করেন।

ক্লাসিক থিয়েটারে থাকাকালীন তিনি 'নির্মলা' নাটকে নিমচাঁদ, 'কাজের খতম' নাটকে চুরুটওয়ালা এবং 'দোললীলায়' গোপ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'দোললীলা' নাটকে "কেন রং দিলি গায় ঢং করে" তাঁর কণ্ঠের এই গানটির সঙ্গে নাচ এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ঐ গানটি সে যুগে লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

১৮৯৮ সালে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রমোদরঞ্জন' নাটক খোলা হয়। নৃপেন্দ্রচন্দ্র চঞ্চলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিন্তু ঠিক এক বছরের ব্যবধানে পুনরায় তিনি ক্লাসিক থিয়েটারে ফিরে আসেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর নাট্যরূপ 'ভ্রমর' নাটক ১৮৯৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হয়। উক্ত নাটকে তিনি হরি চাকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর ২১ বছরের অভিনয়-জীবনে মিনার্ভা, ক্লাসিক, বেঙ্গল, স্টার ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের নাট্যমন্দিরে বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেন। তাঁর যে অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল গিরিশযুগে, তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল শিশিরযুগের উষালগ্নে।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র তাঁর 'রঙ্গালয়ে নেপেন' নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন— "...আলিবাবার পর নেপেন দর্শকের নিকট বিশেষ পরিচিত হইল। পূর্বে যাহারা নৃপেনের নাম শুনিয়া বিদ্রূপ করিতেন, তাঁহারা বিশেষরূপে বুঝিলেন যে, নেপেন বিদ্রূপের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে। যত প্রকার নৃত্য ইতিপূর্বে চলিয়া আসিতেছিল, নেপেনের নৃত্যের প্রথা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। রঙ্গালয়ে নিম্নশ্রেণীস্থ অভিনেত্রীগণ প্রায় একস্থানে স্থায়ী নয়, কিন্তু তাহাদের লইয়াই কার্য চালাইতে হয়। প্রত্যেক গীতিনাট্যে নূতন লোককে শিখাইয়া কার্যোপযোগী করিতে হয়, ইহা নৃত্যশিক্ষকের

সামান্য বাধা নয়। কিন্তু নেপেনের উদ্যমে কেবল যে প্রত্যেক বাধা অতিক্রমিত হইত, তাহা নয়,—প্রতিবারই কোনো না কোনো নূতন ঢং দর্শক দেখিতে পাইতেন। নেপেন এখন রঙ্গালয়ে প্রধান এবং সেই প্রাধান্য রক্ষা করিবার চেষ্টা নেপেনের অপরিমিত।"

গিরিশচন্দ্র তাঁর জীবদ্দশায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের গুণপনার কথা যেভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা কম শ্লাঘার কথা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রশংসা নৃপেন্দ্রচন্দ্র লাভ করেছিলেন, তাঁর প্রতিভার সে প্রশংসা বিংশ শতাব্দীতেও ম্লান হয়নি। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের নাট্যমন্দিরে 'বসন্তলীলা'র জন্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন—"স্টার থিয়েটার হঠাৎ 'সীতাহরণ' করাতে শিশিরকুমার মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। অভিনয়ের বিজ্ঞাপিত তারিখ সামনেই। নূতন পুরাতন কোন নাটকই মহলা দিয়ে তৈরি করবার সময় নেই। ভেবে চিন্তে ঠিক করা হলো, নাটকের অভিনয় যখন অসম্ভব, তখন সেদিন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের নায়কতায় হোরীব গানের আসর বসিয়ে নব রঙ্গালয়েয় উদ্বোধন করা হবে।

কয়েকটি পুরাতন ও বিখ্যাত হিন্দী গান নির্বাচিত হলো। আমি শিশির ও মণিলালকে বললুম, দেখ খালি পুরোনো কেন, দু-চারটে নতুন গান জুড়ে দিলে কেমন হয়? কথাটা তাঁদের মনে লাগল। আমি গুটি কয়েক গান লিখলুম। মণিলালও গুটি ছয়েক গান লিখলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ও গুরুদাস গানগুলি সুর সংযোগ করলেন এবং গানের মহলা শুরু হলো। নৃপেন্দ্রচন্দ্র করলেন নাচের পরিকল্পনা।" 'বসন্তলীলা'র নাচের পরিকল্পনায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র।

১৯২১ সালে বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীতে শিশিরকুমারের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। 'আলমগীর' নাটকে গরিব-দাসের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এবং আলফ্রেড মঞ্চে শিশিরকুমারের সঙ্গেই তাঁর শেষ অভিনয়। ইং ১৯২৭ সালে, বাং ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে ৬০ বছর বয়সে নৃপেন্দ্রচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁর

মৃত্যুর পর 'নাচঘর' পত্রিকায় লেখা হয়—"নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নৃত্য-প্রতিভার প্রধান প্রমাণ তাঁর নূতনত্ব। অমরেন্দ্রনাথের যুগে ক্লাসিক থিয়েটারে বাংলা নাচের শ্রী তিনি একেবারেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত নাচের গুণেই 'আলিবাবা' আজ পর্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে আছে। এখনো বাংলা রঙ্গালয়ের নাচ প্রধানত তাঁর ছাঁচেই ঢালা হয়। শুধু নৃত্য পরিকল্পনায় নয়, নৃত্য নিপুণতায়ও আর কোন বাঙ্গালী নর্তক এখনো নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে অতিক্রম করতে পারেন নি। আবদাল্লা (আলিবাবায়), ঘেষেড়া (পাণ্ডবগৌরবে), গোপ (দোল-লীলায়), উৎপল (কিন্নরীতে), আলাদিন (আলাদিনে) ও নাগরিক (বসন্তলীলায়) প্রভৃতি ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নৃত্যকৌশল দেখবার সুযোগ যাঁদের হয়েছে, তাঁরা কখনো তাঁকে ভুলতে পারবেন না। তাঁর অভিনয় শক্তিও বড় কম ছিল না। আবদাল্লা (আলিবাবায়), হামজাদ (শিরী-ফরহাদে), গঙ্গাজী (ছত্রপতি শিবাজীতে), জগন্নাথ (শঙ্করাচার্যে) ও কাঙালীচরণ (প্রফুল্লে) প্রভৃতি ভূমিকায় আজও তাঁর অভিনয়কুশলতা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে।…"

নট-নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী

নট ও নাট্যকাব মনোমোহন গোস্বামীর কথা বর্তমানে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। অথচ তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হয়ে সবপ্রথম নটনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ কবেছিলেন। 'রঙ্গভূমি ভালবাসিলাম কেন' প্রবন্ধে মনোমোহনবাবু লিখেছেন—"স্টার ও ক্লাসিক উভয় থিয়েটাবেই 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয়ের ধুম পড়িয়া গেল এবং উভয় বঙ্গালয়েই অগণ্য জনসমাগম হইতে লাগিল। গিরিশ-বাবুর সুযোগ্য পুত্র উৎকৃষ্ট অভিনেতা দানিবাবু শঙ্কবেব ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্লাসিকে পাঁচ রাত্রি মাত্র 'প্রতাপাদিত্য' অভিনীত হইবার পর একটি বুধবার দানিবাবু ক্লাসিকের সংস্রব পবিত্যাগ করিয়া অন্য রঙ্গালয়ে যোগদান করিলেন। অমরবাবু আমাকে বলিলেন, 'তুই এক দিনের মধ্যে এত বড় অংশ বিশেষ যাহা দানি অভিনয় করিয়া গিয়াছে, সে অংশ তুমি অভিনয় করিলেই ভাল হয়। আব প্রতাপাদিত্যের অভিনয় যদি বন্ধ করি, লোকসানের কথা ধরি না, আমাব থিয়েটারের বড়ই দুর্নাম হইবে। অতএব আমার অনুরোধে তোমাকে এই অংশটি অভিনয় করিতে হইবে। নতুবা আমি বড়ই দুঃখিত হইব।' আমি অগত্যা সম্মত হইলাম। এ সম্মতির প্রধান কারণ দুইটি : (১) বন্ধুকে প্রকৃত আবশ্যকের সময় সাহায্য প্রদান, (২) বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের উন্নাত সাধন। ...যে বিদ্যালোক রঙ্গালয়ে অধিকতর প্রবেশ না করিলে প্রকৃত উন্নতি সাধন প্রায অসম্ভব। কিন্তু কৃতবিদ্য যুবক লোকনিন্দার ভয়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করিতে পারেন না। তাই আমিই পথ-প্রদর্শক হইলাম ; লোকনিন্দার গুরুভার প্রথমে আমিই মস্তকে ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

একবার নাম লিখাইয়া আর অবগুণ্ঠন চলে না। তাই এতদবধি আমি কোনো না কোনো রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি।"

১৯০৩ সালের ১০ই অক্টোবর মনোমোহন 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে শঙ্করের ভূমিকা তাঁর বন্ধু নট-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধে সর্বপ্রথম অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন তাঁর বয়স ৩২ বছর।

হাওড়া জেলার বালিতে ১৮৭১ সালে মনোমোহন গোস্বামী জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। মাতা বিনোদিনী দেবী ছিলেন একাধারে স্নেহশীলা গৃহকর্মে সুনিপুণা ও ভক্তিমতী। শাস্ত্রজ্ঞ স্বামীর যোগ্যা সহধর্মিণী।

পিতামাতার চেষ্টা ও যত্নে মনোমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কাস্টম হাউস-এ চাকরি গ্রহণ করেন। নিজের কর্মদক্ষতায় শেষ জীবনে তিনি কাস্টম হাউস-এ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি নাট্য-রচনা ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। কিন্তু গ্র্যাজুয়েট না হওয়া পযন্ত তিনি নাট্য-চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেননি। গ্র্যাজুয়েট হওয়ায় পর, তিনি নাটক রচনা ও শৌখিন দলে অভিনয় করা শুরু করেন। এই সময়ে তিনি ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে 'সঙ্গীত সমিতি'র আমন্ত্রণে নিজের সম্প্রদায় নিয়ে কয়েকবার অভিনয় করেন। এই সূত্রেই অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। উত্তরকালে এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে মনোমোহনবাবু লিখেছেন— "...তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আমি সুখী ভিন্ন অসুখী নহি, গর্বিত ভিন্ন লজ্জিত নহি। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব আমার জীবনস্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত করিল। বালককাল হইতে যে বীজ হৃদয়ে নিহিত ছিল, উপযুক্ত ভূমির অভাবে যাহা মঞ্জুরিত হইয়াও স্বাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, ভূমি সাহায্যে ও সলিল সেচনে তাহাই শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রকাণ্ড মহীরুহের আকার ধারণ করিল।"

ক্লাসিক থিয়েটার থেকে অমরেন্দ্রনাথ 'রঙ্গালয়' নামে সাপ্তাহিক

পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০১ সালে মনোমোহনবাবু ঐ পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রদত্ত 'কপালকুণ্ডলা' নাটকের তুলনামূলক এক সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর ঐ প্রবন্ধটি নাট্যশালার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। এর কিছুদিন পরে তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'রোশিনারা' প্রকাশিত হয়। অমরেন্দ্রনাথ ঐ নাটকটির কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ১৯০২ সালের ২২শে মার্চ, 'শিবজী' নামে ক্লাসিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, 'শিবজী'ই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক।

মনোমোহনবাবু প্রথমে নাট্যকার রূপে রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে এলেও, তার এক বছর পরে নট ও নাট্যকাররূপে শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি রঙ্গালয়ের সেবা করে গেছেন। তাঁর রচিত 'সংসার', 'পৃথ্বীরাজ', 'সমাজ', 'কর্মফল', 'ধর্মবিপ্লব' প্রভৃতি নাটকগুলি বিশেষভাবে জন-সমাদৃত হয়। এর মধ্যে 'শিবজী', 'সংসার' ও 'কর্মফল' নাটকের অভিনয় ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। অথচ তিনি ইংরেজ সরকারের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর রচিত নাটক রাজরোষ পতিত হলেও, তিনি নির্ভীক চিত্তে সরকারী কাজ করে গেছেন। তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা তেরটি।

নাটক রচনা ছাড়াও তাঁর নাট্যশালা সম্পর্কিত সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি সে যুগে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল। বর্তমানে তাঁর প্রবন্ধগুলি গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মনোমোহনবাবু সফল নাট্যকাররূপে যেমন খ্যাতি অর্জন করে-ছিলেন, তেমনি দক্ষ নটরূপেও তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বহু নাটকে বহু বিচিত্র চরিত্রে তিনি রূপদান করেছেন। তার মধ্যে 'বঙ্গের শেষ বীর' বা 'প্রতাপাদিত্য'-এ শঙ্কর, 'সিরাজউদ্দৌলায়' ক্লাইভ, 'কাল পরিণয়ে' তারক ঘোষ, 'জনায়' অর্জুন, 'রাজসিংহে' মোবারক, 'সধবার একাদশী'-তে ঘটিরাম, 'প্রফুল্ল'-তে মদন ঘোষ, 'পলাশীর যুদ্ধ'-এ

রাজবল্লভ, 'খাস দখল'-এ সুরেশ, 'পদ্মিনী'-তে আলাউদ্দীন, 'বলিদানে' মোহিত, 'চোখের বালি'-তে বেহারী, 'ধর্মবিপ্লব'-এ নিরঞ্জন, 'কর্ম-ফল'-এ নগেন, 'সমাজ'-এ পরেশ, 'পৃথ্বীরাজ'-এ যোধমল, 'সংসার' নাটকে প্রিয়নাথ প্রভৃতি চরিত্রগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'নাট্যমন্দির' শ্রাবণ ১৩১৮ ও শ্রাবণ ১৩১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কলাবিদ্যার বিপর্যয়ে' নামক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯২০ সালের ৬ই নভেম্বর, নট-নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী মাত্র ৪৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যাঁর জীবনাবসান হয়েছে, বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ছয় দশকের ব্যবধানে তাঁকে আজ আমাবা ভুলতে বসেছি।

ট্র্যাজেডিয়ান অমৃতলাল মিত্র

নাট্যশালার গোড়ার যুগে দুই অমৃতলাল বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময় এঁদের অবদান নাট্যশালার ইতিহাসে বিশেষভাবে বিবৃত হয়ে আছে। এঁরা হলেন নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু (পরবর্তীকালে 'রসরাজ' নামে খ্যাত) ও অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। অমৃতলাল বসু সুদীর্ঘকাল নটনাথের সেবা করে গেছেন নটরূপে, নাট্যকাররূপে, নাট্যশিক্ষক ও নাট্যশালার সুদক্ষ পরিচালকরূপে। আর অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে কি স্ত্রী চরিত্রে কি পুরুষ চরিত্রে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীত শিল্পীরূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল। আবার হাল্কা রসের অভিনয়েও তিনি ছিলেন দক্ষ। কিন্তু এই খ্যাতকীর্তি অভিনেতা অল্প বয়সে আত্মহনন করে তাঁর জীবনের অবসান ঘটান।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচ বছর পরে, আর এক শক্তিমান অভিনেতার আবির্ভাব ঘটে, ইনিও অমৃতলাল, তবে মিত্র। প্রথম জীবনে অমৃতলাল মিত্র যাত্রায় অভিনয় করতেন। সে যুগের একচ্ছত্র নায়ক মহেন্দ্রলাল বসুর মত ইনিও ছিলেন গিরিশচন্দ্রের বন্ধু গোপাললাল মিত্রের পুত্র। মহেন্দ্রলালের 'কপালকুণ্ডলা' নাটকে নবকুমারের অভিনয় দেখে, অমৃত মিত্র মঞ্চের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন এবং গিরিশচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন। ইনি যেমন সুচেহারার অধিকারী ছিলেন, তেমনি তাঁর কণ্ঠস্বরটিও ছিল জলদগম্ভীর ও মাধুর্যময়।

১৮৭৭ সালের ১লা ডিসেম্বর, ন্যাশনাল থিয়েটারে 'মেঘনাদবধ' নাটকে রাবণের ভূমিকায় তিনি সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। 'মেঘনাদবধে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৭৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর

'সমাচার চন্দ্রিকায়' এক জায়গায় লেখা হয়, 'যিনি রাবণের অংশে অভিনয় করেন, তাঁহাকে আমরা চিনি না, কিন্তু তাঁহার অভিনয় দর্শনে আমরা প্রীত হইয়াছি।'—প্রথম মঞ্চাবতরণেই অপরিচিত অমৃতলাল এইভাবে দর্শকদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

এই 'মেঘনাদবধ' অভিনয়ের পরেই ১৮৭৮ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার হস্তান্তরিত হয়। গিরিশচন্দ্র ও তাঁর কয়েকজন অনুগামী এই সময় ন্যাশনাল থিয়েটাবের সংস্রব ত্যাগ করেন। এই অনুগামীদের মধ্যে অমৃত মিত্র ছিলেন অন্যতম।

এরপর প্রতাপচাঁদ জহুরী ন্যাশনাল থিয়েটার পরিচালনার দায়িত্ব-ভাব গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্রকে প্রতাপচাঁদ তাঁর থিয়েটারে নট-নাট্যকার ও ম্যানেজাররূপে নিযুক্ত কবেন। গিরিশচন্দ্র এই সময় পার্কার কোম্পানিতে ১৫০ টাকা বেতনে বুক-কীপারের চাকুরি করতেন। প্রতাপচাঁদের আহ্বানে ১৫০ টাকার মাহিনার চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে, ১০০ টাকা বেতনে সর্বপ্রথম রঙ্গালয়ে বেতনভুক নট ও নাট্যশালার পরিচালকরূপে যোগদান করলেন।

১৮৮১ সালের ১লা জানুয়ারি কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামির' নাটক গিরিশচন্দ্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হলো। অমৃতলাল মিত্র নীলন-দেবের চরিত্রে রূপদান করলেন। এরপর প্রতাপ জহুরীর আমলে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিটি নাটকে তিনি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করে তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। প্রতাপ জহুবীর ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ নাটক গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। এই নাটকে অমৃতলাল ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে'র অভিনয় সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছেন— "…একের পর এক অভিনেতা অভিনেত্রীরা রঙ্গমঞ্চে আসছেন এবং তাঁদের অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকচিত্তে উত্তেজনা ধাপে ধাপে উঠতে থাকে। ভীমরূপী অমৃতলাল মিত্র, দ্রৌপদীর চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী

এবং কীচকবেশী গিরিশচন্দ্র কীচকবধ অধ্যায়ে তাঁদের অনবদ্য অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকচিত্ত জয় করে নিলেন এবং দর্শকগণের বিস্ময়, কৌতূহল ও উত্তেজনাকে এমন চরম পর্যায়ে নিয়ে এলেন যে, মনে হ'ল এরপর আর কারো অভিনয় দর্শকচিত্তে রেখাপাত করতে পারবে না।...”

প্রতাপ জহুরীর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়ে সদলবলে গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে আসেন। এবং ১৮৮৩ সালে গুর্মুখ রায়ের সহযোগিতায় ৬৮নং বিডন স্ট্রীটে ‘স্টার থিয়েটারে'র পত্তন করেন। ১৮৮৩ সালের ২১শে জুলাই গিরিশচন্দ্রের ‘দক্ষযজ্ঞ' নাটক নিয়ে নবনির্মিত স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। অমৃতলাল ‘দক্ষযজ্ঞ' নাটকে মহাদেবের ভূমিকায় রূপদান করেন। অভিনেত্রী বিনোদিনী তাঁর ‘আমার কথা'য় ‘দক্ষযজ্ঞ' নাটকের উদ্বোধন রজনীর স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন—“প্রথম দিনের সে লোকারণ্য, সেই খড়খড়ি দেওয়ালে লোক সব ঝুলিয়া ঝুলিয়া বসিয়া থাকা দেখিয়া আমাদের বুকের ভিতর দুর দুর করিয়া কম্পন বর্ণনাতীত! আমাদেরই সব ‘দক্ষযজ্ঞ' ব্যাপার! কিন্তু যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেবতার বরে যেন সত্যিই দক্ষালয়ের কার্য আরম্ভ হইল। বঙ্গের গ্যারিক গিরিশবাবুর সেই তেজপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি যখন স্টেজে উপস্থিত হইল তখন সকলেই চুপ। তাহার পর অভিনয় উৎসাহ, সে কথা লিখিয়া বলা যায় না। গিরিশবাবুর দক্ষ, অমৃত মিত্রের মহাদেব যে একবার দেখিয়াছে, সে কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। ‘কে-রে, দে-রে, সতীরে আমার' বলিয়া যখন অমৃত মিত্র স্টেজে বাহির হইতেন তখন বোধহয় সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত।”

‘দক্ষযজ্ঞে'র পর ১৮৮৩ সালের ১১ই আগস্ট ‘ধ্রুবচরিত্র' নাটকে উত্তানপাদ ও ১৮৮১ সালের ২২শে ডিসেম্বর ‘নলদময়ন্তী নাটকে নলের ভূমিকায় অমৃতলাল অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ‘নল-দময়ন্তী' নাটক অভিনয় চলাকালীন স্বজাতির তাড়নায় গুর্মুখ রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্টার থিয়েটার বিক্রয় করতে বাধ্য হন। এই সময়

অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃতলাল বসু ১১ হাজার টাকায় স্টার থিয়েটারের স্বত্ব ক্রয় করেন। অমৃতলাল এখন থেকে স্টার থিয়েটারের অন্যতম মালিক হলেন। বহু উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে স্টার থিয়েটার তার ঐতিহ্যকে বজায় রেখে এসেছে। তার অন্যতম ধারক ছিলেন অমৃতলাল মিত্র। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্টার থিয়েটারের অন্যতম মালিক ও অভিনয় শিল্পীরূপে যুক্ত ছিলেন তিনি।

অমৃতলাল ছিলেন গিরিশচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন ভাবশিষ্য ও বিশ্বস্ত সহকর্মী। অমৃতলাল ছিলেন সর্বগুণসম্পন্ন অভিনেতা। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর ও সেই সঙ্গে অভিব্যক্তি প্রকাশের অসামান্য ক্ষমতা এবং সর্বোপরি তাঁর নটসুলভ চেহারা তাঁকে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নটরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরবর্তীকালে হেমেন্দ্রকুমার রায় অমৃত মিত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন—"তাঁর চেহারা ছিল মঞ্চের উপযোগী। সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু, টিকলো নাক। অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মত তিনিও মঞ্চের উপর আবির্ভূত হয়ে একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ না করেও দর্শকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন।...বিল্বমঙ্গলরূপে তাঁকে আমি দেখেছি বারংবার। কারণ মাত্র দু-একবার দেখলে সে অপূর্ব অভিনয়ের পরিপূর্ণ রস আস্বাদন করা চলত না। প্রাচীন নাটক 'বিল্বমঙ্গল' সেকালে এবং একালে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত বিল্বমঙ্গল-ভূমিকায় অমৃতলালের তুলনা খুঁজতে স্মৃতিসাগর মন্থন করেও অমৃতলাল ছাড়া আর কারুকেই খুঁজে পাই না।"

"অমৃতলালের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নাটক জীবন্ত হয়ে উঠত। তারপর দ্বিতীয় অঙ্কের যেখানে তিনি গলিত শব আলিঙ্গন করে নদী পার হয়ে চিন্তামণির গৃহে গিয়েছেন এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করে দীর্ঘ স্বগতোক্তি করছেন—

এই পরিণাম! এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়, ছিঁড়ে খায়

কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়—

তখন অপূর্ব এক ভাবের বন্যায় প্রত্যেক দর্শকের চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠত। আবার বণিকের গৃহে গিয়ে অহল্যাকে দেখে ক্ষণিক মোহে চঞ্চল হয়েও আত্মসংবরণ করে বিল্বমঙ্গল যখন—

মন এখনো কি আঁখির মমতা কর ?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
সেই আঁখি ব্রজের গোপালে
'আমার' বলিয়ে তুলে নেবে কোলে।
অন্যসব হেরিবে অসার।
যাও যাও নশ্বর নয়ন—

বলে কাঁটা দিয়ে স্বহস্তে নিজেই দুই চক্ষু বিদ্ধ করতেন, দর্শকেরা তখন পাথরের মূর্তির মত স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকত।"

নাট্যমঞ্চে অমৃতলাল যখন মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যের মত দেদীপ্যমান, হেমেন্দ্রকুমারের এ প্রশংসামূলক রচনা তখনকার। কিন্তু শেষ জীবনেও তাঁর এই অভিনয় প্রতিভা যে এতটুকুও ম্লান হয়ে যায়নি তা প্রমাণিত হয় অপরেশচন্দ্রের লেখনীর মাধ্যমে। অপরেশচন্দ্র 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে লিখেছেন—"স্টারে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে মীরকাশিম সাজিয়াছিলেন স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র। তাঁহার অভিনয় যে অপূর্ব হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্টারে অমৃতলাল যখন মীরকাশিম সাজিতেন তখন তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহার সেই বীরোচিত দীর্ঘ বপু ঈষৎ নুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই বিচিত্র স্বরের অপূর্ব মাধুর্য তাঁহার সেই পরিচিত কণ্ঠকে মমতার আবেগে তখন বাহু বেড়িয়া ধরিয়া আছে, পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

সিংহ স্থবির রোগ-জীর্ণ, কিন্তু তবুও সেই বৃদ্ধ কেশরী 'পলাশীর

প্রায়শ্চিত্তে' মাঝে মাঝে যে বিদ্যুৎ চমক দিতেন তাহাতে দর্শকদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত। 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে'র মীরকাশিমই অমৃতলালের নূতন নাটকে শেষ ভূমিকা গ্রহণ।"

গুরু গিরিশচন্দ্রের প্রতি অমৃতলালের ছিল অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। গিরিশচন্দ্রের স্নেহধন্য অমৃতলালের ঐকান্তিক চেষ্টায় গিরিশ-চন্দ্রেব একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মঞ্চে অভিনেতারূপে পবেশাধিকার পান। গিরিশচন্দ্রেব ইচ্ছা ছিল না যে তাঁর পুত্র নটের বৃত্তি গ্রহণ করেন। অমৃতলাল দানীবাবুকে অভিনয়ের প্রথম পাঠ দিয়ে, গিরিশচন্দ্রের সম্মতি আদায় করেন। পরবর্তীকালে দানীবাবু যে দিক্‌পাল অভিনেতার সম্মানলাভ করেন, তা অমৃতলালেরই ঐকান্তিক চেষ্টার ফল।

১৮৯৩ সালে বহুজনের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইতিপূর্বে স্টার থিয়েটারে তাঁর শিক্ষাধীনে অমৃতলাল যোগেশের চরিত্র-চিত্রণে অসামান্য দক্ষতার পবিচয় প্রদান করেন। তাই গিরিশচন্দ্র প্রথমে তাঁর শিষ্যের অভিনীত চরিত্রে রূপদান করতে সম্মত হননি। শেষ পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশ যখন যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, তখন স্টারের হ্যাণ্ডবিলে লেখা হয়—"তোমারই শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়"। জনৈক দর্শক অমৃতলালের যোগেশ গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলায়, অমৃতলাল প্রতিবাদ করে বলেন—"ও কথা মুখে আনবেন না মশাই! আমি তাঁকে প্রণাম করে মঞ্চে প্রবেশ করি।" অমৃতলালের এমনিই ছিল গুরুভক্তি!

রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অমৃতলালের জন্মতারিখ বা সালের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁর পৈতৃকগৃহ ছিল বর্তমানকালের স্টার লেনে। ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে, ১৯০৮ সালের ২৭শে জুন, অমৃতলাল পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাং ১৩১৫ সালে অমৃতলালের স্মৃতিসভায় গিরিশচন্দ্রের একটি নিবন্ধ পঠিত হয়। ঐ

নিবন্ধটি অমৃতলালের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে, ১৩৩১ সালের ১৭ই আশ্বিন ২২শ সংখ্যা 'নাচঘরে' প্রকাশিত হয়।

স্মৃতিতর্পণ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লেখেন—"রঙ্গালয়ের একটি উজ্জ্বল তারা খসিয়াছে, অমৃতলাল নাই। সহৃদয় দর্শকবর্গ আর তাঁহার মধুর কণ্ঠে বিমোহিত হইবেন না। অমৃতলাল আমার সুহৃদের একমাত্র পুত্র, তাহাকে নগ্নাবস্থায় দেখিয়াছি। প্রথমে তাঁহাব অভিনয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয়ে স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসুর নবকুমারের অংশ দর্শনে তাঁহার রঙ্গালয়ের উপর অনুবাগ জন্মায়। নাট্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ কেদারনাথ চৌধুরীর যত্নে তাঁহার বাসায় একটি সখের থিয়েটার বসে। কেদারনাথের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া অমৃত-লালকে সেই নাট্যসম্প্রদায়ভুক্ত দেখি। 'মেঘনাদবধে'র মহলা চলিতেছে, অমৃতলালের রাবণের অংশ। অমৃতলালের আগ্রহে, এই অংশে আমাব কল্পনা কিরূপ, তাহা ভাব-ভঙ্গির দ্বারা দেখাইতে বাধ্য হইতাম। প্রতাপ জহুরী কর্তৃত্বাধীন ন্যাশনাল থিয়েটারে 'মেঘনাদবধ অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে অমৃতলাল রাবণ সাজিয়া প্রথমে দর্শকবৃন্দের সম্মুখীন হন। তদবধি তাঁহার পটুতা দৃষ্টে, 'সীতার বনবাস' নাটকে আমার অভিনীত 'রামে'র অংশ জনাকীর্ণ রঙ্গালয়ে অমৃতলালকে প্রদান করি। অমৃতলালের অভিনয় দর্শনে দর্শকবৃন্দ একরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে আমা অপেক্ষা তাঁহার অভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল—এই বাক্যে অনেকেই তাঁহার প্রশংসা করেন। অমৃতলালের কৃতিত্বে আমার অভিনয়ের ভার অনেক লাঘব হইল। পরে হ্যাণ্ডবিলে আমার নাম ম্যানেজার দেখিলে, নায়কের অংশ কাহার, তাহা দর্শকগণ বুঝিতেন এবং আগ্রহের সহিত টিকিট কিনিতেন।..."

শিষ্যের প্রতি গুরুর এই প্রশংসাবাণী আজও দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে। আর সেই সঙ্গে করুণ-রস সৃষ্টিতে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বে তিনি রঙ্গজগতে ট্র্যাজেডিয়ানরূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

সুদক্ষ নট অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)

নাট্যশালার গোড়ার যুগের প্রখ্যাত নট অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) সম্পর্কে অমৃতলাল বসু তাঁর 'অমৃত মদিরা' নামক কবিতার একজায়গায় লিখেছেন—

"তথাপি নগেন মতি বেল ধর্মদাস।
অর্দ্ধেন্দু মহেন্দ্র ক্ষেত্রু সে গোপাল দাস॥"

অমৃতলাল তাঁর সুদীর্ঘ কবিতায় সে যুগে যাঁরা সমাজ-সংসার, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের নিন্দা-অপবাদ সব কিছু তুচ্ছ করে, নটনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের সকলের নাম ছন্দোবদ্ধ করে রেখে গেছেন।

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) বাগবাজারের এক অভিজাত জমিদার ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা কলিকাতার আদি বাসিন্দা। বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়। দুর্গাচরণের নাম আজও ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁর কীর্তি-কাহিনীর কথা আজও ও-অঞ্চলে শোনা যায়। দুর্গাচরণের অন্যতম বংশধর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে ১৮নং রাজবল্লভ স্ট্রীটে এক প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণ করে চলে আসেন। মুখোপাধ্যায় পরিবার শুধু শক্ত হাতে প্রজা শাসনই করতেন না, সেই সঙ্গে তাঁরা বহু সদ্‌গুণেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই থাকতো। এই পূজা উপলক্ষে যাত্রাগান, কথকতা, তরজা গানের আসর বসতো। আর সেই সঙ্গে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা ও সমাজ-কল্যাণকর কাজে তাঁরা অকাতরে প্রচুর অর্থ দানও করতেন।

শম্ভুচন্দ্রের পুত্র জগৎচন্দ্র নিজ অধ্যবসায় দ্বারা তাঁদের জমিদারীকে আরো বিস্তৃত করে তোলেন। ফলে, মুখোপাধ্যায় পরিবারের খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে। এই জগৎচন্দ্রের পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র নট

অমৃতলাল বা বেলবাবু। বেলবাবু শৈশবেই মাতৃহারা হন। তাই এই মাতৃহারা শিশুর প্রতি সংসারের সকলের স্নেহ একটু অধিক পরিমাণেই বর্ষিত হ'ত। দেহের বর্ণ ছিল দুধে-আলতার মত। দেহের গড়ন ছিল নধর, গোলগাল। তাই বাড়ীর লোকেরা আদর করে 'বেল' বলে ডাকতেন। নট-জীবনে তাই তিনি অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা 'বেলবাবু' নামেই অধিকতর পরিচিত হয়ে ওঠেন।

বাং ১২৬১ (ইং ১৮৫৪) সালে বেলবাবু জন্মগ্রহণ করেন। সে কালের বাগবাজারের ভার্নাকুলার স্কুলে তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। পরে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু মাতৃহারা বালক পরিবারবর্গের অতিরিক্ত আদরে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে ওঠেন। পূজাপার্বণ উপলক্ষে তাঁদের বাড়ীতে যাত্রা, কথকতা, গান-বাজনার যে আসর বসতো তার প্রতিই তাঁর ছিল প্রবল আকর্ষণ। বিশেষ করে পালাগান বা যাত্রাভিনয় তাঁকে অধিকতর আকৃষ্ট করতো। তাছাড়া সে সময় কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের গৃহে মঞ্চ বেঁধে নাট্যাভিনয়ের যে আয়োজন হ'ত, সেইসব গৃহে জমিদার মুখুজ্যে পরিবারের আমন্ত্রণ আসতো। কাজেই বাল্যকাল থেকেই থিয়েটার দেখার সুযোগও তাঁর হয়েছিল। আর যার ফলশ্রুতি স্বরূপ উত্তরকালে তিনি অভিনয়-কলাবিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লেখাপড়া নর্মাল স্কুলেই শেষ হয়।

যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। বাগবাজারের মুখুজ্যেপাড়ায় অরুণচন্দ্র হালদারের বাড়ীতে তখন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'-র মহলা চলছে। গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি বাগবাজার এ্যামেচার ক্লাবের প্রধান উদ্যোক্তারা বেলবাবুর সুদর্শন চেহারা ও দেহলাবণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাঁকে কুমুদিনীর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য নির্বাচিত করেন। 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় হয় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে ইং ১৮৬৯ সালের

অক্টোবর মাসে। বেলবাবুর বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর।

তাঁর অভিনীত পরবর্তী নাটক 'লীলাবতী'। নাটকটি অভিনীত হয় রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে। সারদাসুন্দরীর ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি দর্শকদের প্রশংসালাভ করেন। তাঁর নটজীবনের প্রথম দিকে তিনি স্ত্রী-ভূমিকাতেই অভিনয় করেছেন। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরেও তিনি কিছুকাল স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করেন। যেমন 'নীলদর্পণ' নাটকে ক্ষেত্রমণি। 'নীলদর্পণ' নাটকে ক্ষেত্রমণির চরিত্রটি নিয়ে নাটকের ঘটনাস্রোত চরম নাট্য-মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছায়। বেলবাবু ক্ষেত্রমণির চরিত্রে এমন প্রাণবন্ত অভিনয় করেন যে, দর্শকেরাও তাঁর অভিনয় দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে রসরাজ অমৃতলাল 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে লিখেছেন— "·········ক্ষেত্রমণির, রেবতীর, সরলার. সাবিত্রীর ও সৈরিন্ধ্রীর বিচিত্র রোদনধ্বনি বাঙ্গালীর বিভিন্ন সমাজস্তরে বিভিন্ন বয়সের রমণীকণ্ঠের আর্তনাদ সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিল।" এরপর 'জামাই বারিক'-এ কামিনী, 'নবীন তপস্বিনী'তে মল্লিকা ও গুরুপুত্র, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে বিলাসবতীর ও 'নয়শো রুপেয়া' নাটকে বামার মা, 'কপালকুণ্ডলায়' মতিবিবির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এখানে উল্লেখ্য, 'নবীন তপস্বিনী'তে গুরুপুত্রই তাঁর প্রথম পুরুষ চরিত্রে অভিনয়।

বেলবাবু তাঁর স্বল্পপরিসর অভিনয়-জীবনে ৩২টির অধিক নাটকে রূপদান করে তাঁর অভিনয় প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। তিনি 'পলাশীর যুদ্ধে' রাজবল্লভের ভূমিকায় যেমন অভিনয় করেছেন, তেমনি এরপরে সিরাজের ভূমিকাতেও রূপদান করেছেন। 'তাজ্জব ব্যাপারে' উড়ে সেজেছেন, আবার 'সরলা'য় গদাধরচন্দ্রের চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন। তিনি সিরিয়াস, সিরিও কমিক, ক্রূর চরিত্র, এমনি কি করুণরসাশ্রিত চরিত্রেও অভিনয় করে তাঁর অপূর্ব অভিনয় দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে সাধক ও 'রূপসনাতন' নাটকে চৈতন্যদেবের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি

প্রশংসিত হন। কিন্তু সর্বোপরি তিনি চিহ্নিত হয়ে আছেন সিরিও-কমিক অভিনেতারূপে।

বাং ১২৯৭ সালের ২রা চৈত্র, মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে বেলবাবু আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৭২ সালে সান্যাল ভবনে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার দিন থেকে তিনি সুযশের সঙ্গে সার্থক নট-রূপে চিহ্নিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর শোচনীয় মৃত্যুতে রঙ্গজগৎ তথা নাট্যামোদিগণ বেদনার্ত হয়ে ওঠেন।

অমৃতলাল অপেক্ষা তিনি বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল নামে সমধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন। প্রথম জীবনে তিনি যে স্ত্রী-চরিত্রগুলি অভিনয় করে গেছেন, তা যে কোন পারদর্শিনী অভিনেত্রীর সমতুল্য। বেলবাবুর মৃত্যুতে সেদিন স্টার থিয়েটারকে তাঁর অভাব পূরণ করতে বেশ কিছু-কাল সময় লেগেছিল।

১৮৯০ সালের ১৮ই মাচ 'রেইজ এণ্ড রায়ত' পত্রিকায় বেলবাবুর শোক-সংবাদ প্রকাশ করে লেখা হয়—"Here is our unformed society nobody thinks of noticing publicity his death or regards it as much of a loss, and no moments perhaps will remain of his worth except in the wicked columns of Reis and Rayat of course, the Star Theatre was closed on last Wednesday out of respect to the memory of this Prince of Actor, who was one of its main pillars."

বেলবাবু সম্পর্কে নটগুরু গিরিশচন্দ্র যে কথা লিখে গেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—"হাস্যরসাভিনয়ে বেলবাবুর একাধিপত্য ছিল, গম্ভীর ভূমিকার অভিনয়েও তাঁহার প্রতিভা স্ফূরিত হইত। 'হারানিধি' নাটকে অঘোরের ভূমিকায় বেলবাবু যখন যেরূপ অবস্থাগত হইতেন, ঠিক সেই ভাবেই অভিনয় করিতেন। 'পলাশীযুদ্ধে' রাজবল্লভ ও 'রামবনবাসে' লক্ষ্মণ, 'আনন্দ রহো' নাটকে

সেলিম, 'অভিমন্যু বধ' নাটকে অভিমন্যু, 'রূপসনাতন' নাটকে চৈতন্যের ভূমিকায় তিনি বরাবর অতি দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করিয়াছিলেন।

বেলবাবু নিজে paint করিয়া মনের মত সাজিতেন—অতি সুন্দর সাজিতেন। সাজিবার তাঁহার নৈপুণ্য ছিল।"

গিরিশচন্দ্র তাঁর 'হারানিধি' নাটকটি বেলবাবুর নামে উৎসর্গ করেন।

হাস্যরসাভিনয়ে সে যুগে অর্ধেন্দুশেখর, রসরাজ অমৃতলাল আর সেই সঙ্গে বেলবাবুরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সে যুগে কেউ কেউ বেলবাবু সম্পর্কে এমন মন্তব্যও করেছেন যে, অর্ধেন্দুশেখর এবং রসরাজ হাস্যরসসৃষ্টিতে অদ্বিতীয় হলেও, বেলবাবু ছিলেন অতুলনীয়।

শ্রীমতী কিরণবালা

বঙ্গরঙ্গালয়ের গোড়ার যুগে এমন এক একজন নট-নটীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা তাঁদের স্বল্পপরিসর জীবনে অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সংসার-রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছেন। সুদক্ষা অভিনেত্রী কিরণবালা তাঁদের একজন। যাঁর প্রচুর সম্ভাবনাময় জীবনের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে, মঞ্চের মানুষদের তাঁর অভাব বেশ কিছুকাল ভোগ করতে হয়েছিল। সে যুগের এমন অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন, যাঁরা মঞ্চকে আকস্মিক দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করে, মঞ্চের মান-মর্যাদা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। কিরণবালা ছিলেন তাঁদেরই অন্যতমা।

সে যুগে মঞ্চ-জগতের সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন বিনোদিনী। বিনোদিনী যে নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, সে নাটকের অভিনয় দেখতে দর্শক উপ্‌চে পড়তো। সাধারণ রঙ্গালয়ে সুদীর্ঘকাল সামগ্রিক অভিনয় অপেক্ষা (টিমওয়ার্ক) নামীদামী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামে টিকিট বিক্রি হ'ত। অবশ্য এর পরবর্তী-কালে বা বর্তমানে যে এ মানসিকতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে তা নয়। তবে বর্তমানে টিমওয়ার্কের দিকে যতটা যত্ন নেওয়া হয়, সে যুগে সামগ্রিক অভিনয় অপেক্ষা প্রধান চরিত্রগুলোর ওপর অধিকতর যত্ন নেওয়া হ'ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৮৮৬সালের ১২ই জুন স্টার থিয়েটারে (বিডন স্ট্রীট) গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে বিনোদিনী চিন্তামণির ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। বিনোদিনীর অভিনয়-জীবনের এটি একটি অবিস্মরণীয় অভিনয় বলা যেতে পারে। 'বিল্বমঙ্গল' নাটক যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, সেই সময় গিরিশচন্দ্রের কানে আসে, বিনোদিনী অভিনয়-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সংসার-জীবনে প্রবেশ করবেন।

গিরিশচন্দ্র এ কথাটা গোপন রাখেন এবং যথারীতি উৎসাহের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী নতুন নাটক 'বেল্লিক বাজারে'র মহলা দিতে থাকেন। 'বেল্লিক বাজার' নাটকে বিনোদিনীকে রঙ্গিনীর ভূমিকা দেওয়া হয়। ১৮৮৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, 'বেল্লিক বাজার' মঞ্চস্থ হয় এবং বিপুল জনসমাদর লাভ করে।

সেকালের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাং ১২৯৪ সালের 'সাধারণী'তে 'বেল্লিক বাজারে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন—"বেল্লিক-বাজার রুচিবিকারে ফুটিয়াছে। বেল্লিক বাজার অভিনয়ে বড়ই ফুটন্ত। জীবন্ত। রঙ্গরুচি যে আমাদিগের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া নীতি-প্রীতির মূল উল্টাইয়া আমাদিগকে পদে পদে পেষণ করিতেছে, পদে পদে স্বার্থের দায় ভদ্রাচারে জলাঞ্জলি দিতেছে, তাহা ইহাতে একরকম চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে।" কিন্তু এ সমস্ত প্রশংসাবাদই ব্যর্থ হয়ে গেল! গিরিশচন্দ্রের অনুমান সত্যে পরিণত হ'ল। বিনোদিনী চিরতরে মঞ্চের সংস্রব ত্যাগ করে, সংসার জীবন যাপন করতে চলে গেলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। তিনি তলে তলে কিরণবালাকে বিনোদিনীর অভিনীত চরিত্রগুলির অভিনয়-শিক্ষাদান করতে লাগলেন। বিনোদিনীর বিকল্পরূপে কিরণবালাকে দিয়ে অভিনয় করানোর ব্যাপারে সেদিন অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। অনেকে এমন ধারণাও পোষণ করেছিলেন যে, গিরিশচন্দ্র বোধহয় একটা মস্ত ভুল করতে চলেছেন। কিরণবালাকে তৈরি করার জন্য গিরিশচন্দ্র অকাতরে যে পরিশ্রম করে চলেছেন, তা ব্যর্থ হবে। কিন্তু সকলের সব সন্দেহ ও আশঙ্কার নিরসন হ'ল, যেদিন কিরণবালা 'বেল্লিক বাজারে' রঙ্গিনীর ভূমিকায় রূপদান করে দর্শকদের প্রশংসালাভ করলো। আর সেইসঙ্গে সেদিন মঞ্চের অভিনেতৃবর্গ এবং কলাকুশলীরা একযোগে স্বীকার করলেন, গিরিশচন্দ্র শুধু শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার নন—তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্য-শিক্ষক। কিরণবালা গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় অল্পদিনের মধ্যেই সুদক্ষা নটীরূপে চিহ্নিত হলেন।

এরপর ১৮৮৭ সালে ২রা জুন, স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'রূপ সনাতন' নাটক মঞ্চস্থ হ'ল। এই নতুন নাটকে কিরণবালা বিশাখার চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেলেন। বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারে এইটাই শেষ নাটক। বিশাখার চরিত্রে কিরণবালা সুঅভিনয় করে প্রশংসা পেলেন বটে, কিন্তু তার পরের মাসে অর্থাৎ ৩১শে জুলাই ১৮৮৭ সালে স্টার সম্প্রদায় 'বুদ্ধদেব চরিত্র' ও 'বেল্লিক বাজার' অভিনয় করে বিডন স্ট্রীট থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন।

কিরণবালা কিন্তু স্টার থিয়েটারের শিল্পীভুক্ত হয়েই রইলেন।

হাতীবাগানে স্টার থিয়েটারে নতুন বাড়ী তৈরি শুরু হ'ল। দশ মাসের মধ্যে স্টার থিয়েটারের নতুন অভিনয়-গৃহ তৈরি হয়ে গেল। ১৮৮৮ সালের ২৫শে মে, গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটক নিয়ে স্টার থিয়েটারের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন হ'ল। এরপর ২৪শে সেপ্টেম্বর তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'সরলা' নামে অভিনীত হ'ল। 'সরলা' নাটকের মুখ্যচরিত্র 'সরলা'র ভূমিকায় রূপদান করলেন কিরণবালা। এই নাটকে অভিনয়ের পর তাঁর খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়লো। মঞ্চ-জগতের মানুষেরা আশা করলেন, কিরণবালা অচিরেই বিনোদিনীর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পারবেন। ১৮৮৯ সালের ২৭শে এপ্রিল স্টারে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটক মঞ্চস্থ হ'ল। জ্ঞানদার কঠিন চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করলেন কিরণবালা। অল্প কালের মধ্যে গিরিশচন্দ্র তাঁকে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ দিলেন। 'প্রফুল্ল' মঞ্চস্থ হওয়ার পর, ৭ই সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হ'ল গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি'। এই নাটকে কমলার চরিত্রেই তাঁর শেষ অভিনয়।

১৮৯০ সালের ১৮ই মার্চ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) মারা গেলেন। আর তার একমাস পরে অর্থাৎ এপ্রিল মাসে বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হয়ে কিরণবালা পরলোকগমন করলেন। পর পর দু'জন কৃতি শিল্পীর তিরোধান স্টার থিয়েটারকে বিপন্ন করে তুললো।

স্টার থিয়েটারকে তিনমাসের জন্য অভিনয় বন্ধ রাখতে হ'ল। মৃত্যু-কালে কিরণবালার বয়েস হয়েছিল মাত্র ২২ বছর।

নিষিদ্ধ পল্লীর এক অন্ধকার ঘরে ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেছিল কিরণবালা। পিতৃ-পরিচয়হীনা কিরণবালা ১৩ বছর বয়সে মঞ্চে যোগদান করে, পাদপ্রদীপের আলোর পরশ পেয়েছিল। আর সেই সঙ্গে ধাপে ধাপে খ্যাতির উচ্চ শিখরে যখন উঠতে আরম্ভ করেছিল, সেই সময়েই অকালমৃত্যু তাকে গ্রাস করলো।

কিরণবালার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'রেইজ এ্যাণ্ড রায়ত' পত্রিকায় কিরণবালা সম্পর্কে লেখা হয়—"The dead actress was a rare flower of her profession, another young genius who promised to burst before long into full bloom and splendour. In so young an age, she betrayed extra-ordinary talents. She had to interpret Chaitanya, perhaps the most difficult of Bengalee dramatic characters, and in her delineation of it she proved herself throughly deserving of the exalted lift, if not equal to her glorious predecessor. As Sarala, she might be said to have made her real debut, and as Sarala, it is enough to say, she can never be for-gotten, for even now at the mention of the picture, many a playgoers' eyes must glisten with a tear."

১৮৯০ সালের ২৪শে জুন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় কিরণবালাকে Bengali Siddens বলে অভিহিত করা হয়।

সঙ্গীত-নিপুণা অভিনেত্রী শ্রীমতী নরীসুন্দরী

খ্যাতকীর্তি গায়িকা-অভিনেত্রী শ্রীমতী নরীসুন্দরীর জন্ম ইং ১৮৭৭ সালে। তাঁর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ১৮৯২ সালে। সে সময়ে তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর। ঈশ্বরদত্ত সুকণ্ঠের অধিকারিণী হয়েই জন্মেছিলেন তিনি। কখনো কারুর কাছে গান শিখেছিলেন কিনা তা অবশ্য জানা যায় না। তবে সে যুগে তিনি বহু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মঞ্চ থেকে গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন। বহু নাটকের গান, তাঁর কণ্ঠে গীত হয়ে সে যুগে এতই জনসমাদর লাভ করেছিল যে, তাঁর অধিকাংশ গানই গ্রামোফোনে রেকর্ড হয়ে বহুল প্রচারিত হয়।

নরীসুন্দরী প্রসিদ্ধা সঙ্গীত-শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হলেও, কোমলা ও সরলা নারী চরিত্রে অভিনয় করারও তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ১৯০১ সালের ১৩ই এপ্রিল, স্টার থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে সূর্যমুখীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে, নরীসুন্দরী তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

নরীসুন্দরী রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ১৮৯২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর, স্টার থিয়েটারে অভিনীত কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ঋষ্যশৃঙ্গ' নাটকের নাম-ভূমিকায়। এরপর ১৮৯৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর, স্টার থিয়েটারে রসরাজ অমৃতলাল প্রদত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। নরীসুন্দরী দলনী বেগমের ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। এই নাটকে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, যথাক্রমে অমৃতলাল বসু ও নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী। কিন্তু নাটকের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠলেন দলনী। এ সম্পর্কে রমাপতি দত্ত তাঁর 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ৪৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"সত্যকারের দলনী বেগমও বুঝি অমন মর্মস্পর্শী অভিনয় করতে পারিত না। তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত 'আজু

কাঁহা মেরি' গান এখনও কর্ণে মধু বর্ষণ করিতেছে। শোনা যায়, বহু দর্শক নাকি মাত্র এই গানখানি শুনিবার জন্যই রঙ্গালয়ে আসিতেন। ফুল হাউস বিক্রি, কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দলনীর এই গানের পর, পঞ্চমাঙ্কের পটোত্তোলনের সময় দেখা গেল যে রঙ্গগৃহে মাত্র মুষ্টিমেয় দর্শক বিদ্যমান। মিনার্ভায় চন্দ্রশেখর অভিনয়কালে, সুশীলার মত সর্বগুণসমন্বিতা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ও খ্যাতনামা গায়িকাও দলনীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া নরীসুন্দরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইতে প্রথমে কিছুতেই সম্মত হন নাই, ... ।"

নরীসুন্দরী একাদিক্রমে ১৯ বৎসরকাল স্টার থিয়েটারে অভিনয় করেছেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে স্টার থিয়েটারকে বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর তারই সুযোগ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটার থেকে নরীসুন্দরীকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার বার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু নরীসুন্দরী স্টার থিয়েটার ছেড়ে যাননি। যে থিয়েটার তাঁকে অভিনয়-জীবন আরম্ভ করার সুযোগ দিয়েছিল, সেই থিয়েটারের প্রতি তিনি আনুগত্য প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। আর্থিক প্রলোভনেও প্রলুব্ধ হননি। নরীসুন্দরীর জীবনের এও একটা উল্লেখযোগ্য দিক।

নরীসুন্দরী স্টার থিয়েটারে থাকাকালীন ৪১টি নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করে, তাঁর অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এর মধ্যে 'চন্দ্রশেখরে' দলনী, 'রাজসিংহ'-এ দরিয়া, 'কালাপাহাড়'-এ দেলেনা, 'মায়াবসান'-এ রঙ্গিণী, 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখী, 'প্রতাপাদিত্যে' বিজয়া, 'রাণা প্রতাপে' মেহেরউন্নিসা, 'রাণী ভবানীতে' সবিতা, 'বেহুলায়' মণিভদ্রা, 'অহল্যা বাঈ'-এ গঙ্গাবাঈ প্রভৃতি চরিত্রগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯১১ সালে পাঁচ হাজার টাকা বোনাসের বিনিময়ে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। সে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক-অভিনয়ের প্রস্তুতিপর্ব চলছিল। নরীসুন্দরী

এখানে যোগদান করে ছায়ার চরিত্রে রূপদান করলেন। অভিনয়ে ও গানে ছায়ার চরিত্রটিকে তিনি প্রাণবন্ত করে তুললেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হলো ১৯১১ সালের ২২শে জুলাই। এরপর ১৯১১ সালের ১৮ই নভেম্বর, গিরিশচন্দ্রের 'তপোবল' নাটকে তিনি বেদমাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দু'টি নাটকেই অভিনয়ে ও গানে নরীসুন্দরী দর্শকদের নিকট প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি পুনরায় স্টার থিয়েটারে ফিরে যান।

১৯১২-১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি পুনরায় স্টার থিয়েটারে অভিনয় করেন। স্টার থিয়েটারে তাঁর শেষ অভিনয়, ১৯১৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভিনেত্রীর রূপ' নাটকে অপরাজিতার ভূমিকায়।

১৯১৫ সালে আবার তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে ফিরে আসেন এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'সিংহল বিজয়' নাটকে লীলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

নরীসুন্দরীর সমগ্র অভিনয়-জীবনের অধিকাংশ সময় স্টার থিয়েটারে অতিবাহিত হয়েছে। মধ্যে কয়েক বছর মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করেছেন মাত্র।

১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি, নটগুরু গিরিশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। এর অব্যবহিত পরে স্টার থিয়েটারে নট-নাট্যকার অমরেন্দ্র-নাথ দত্তের সভাপতিত্বে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নরীসুন্দরী এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাটি বাং ১৩১৯ সালের 'নাট্যমন্দির' পত্রিকার ৩য় বর্ষের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে নরীসুন্দরী বলেন—"আমি বক্তৃতা করিতে জানি না ও কখনও কোন প্রকাশ্য সভায় বলিবার অবসরও পাই নাই, এ কথা বোধহয় আর বেশি করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জীবনের সঙ্গে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের যত নিকট সম্বন্ধ, এত বোধহয় আর কাহারও নয়। গিরিশবাবু ছিলেন আমাদের গিরিশবাবু; তিনি বাঁচিয়া থাকিতে

আমরা দিনে নিদেন সাত আটবার তাঁহার নাম করিতাম, এখন তিনি আমাদের ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তবু তাঁহার নাম আমাদের মুখে আছে। গিরিশবাবু অনেক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতি চিরকাল সে সব নাটক পড়িবে, পড়িয়া আনন্দ পাইবে, শিক্ষা পাইবে, হয় ত কোন কোন ভাগ্যবান সেইসব নাটকের আলোতে ভগবানের কাছে যাইবার একটা সোজা পথও দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আমরা তাঁহার চরণতলে বসিয়া তাঁহার বা তাঁহার কৃতী শিষ্য বিশেষের উপদেশে সেই সব নাটকের চরিত্রসকলে জীবন সঞ্চার করিতে শিখিয়াছি।

আমার জন্মের পর, সাধুসমাজ আমায় বলিয়াছিলেন যে, 'পুণ্যের ছাপমারা কুলে তোর যখন জন্ম নয়, তখন তুই চিরদিন পাপই করিতে থাক্ আর আমরা পুণ্যের তেজে তোদের গাল দিতে ঘৃণা করিতে থাকি।' কিন্তু গিরিশবাবু অতটা পুণ্যবান ছিলেন না, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, তাই তিনি আমার মত অভাগিনীর মুখ দিয়াও 'চৈতন্যলীলা'র নিতাইয়ের, 'বিল্বমঙ্গলে'র পাগলিনীর মধুময় কথা বলাইয়া ছিলেন। গিরিশবাবুর কৃপায় আমি হরিনাম গাহিয়াছি,—প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সেই পতিতপাবনের নাম গাহিয়াছি। তাই আজ সেই শুধু নটগুরু নয়, সেই ধর্মগুরুর দেবচরণে অবনত মস্তকে ভক্তিপূর্ণ কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি।"

১৯১৬ সালের পর, তিনি নিয়মিত অভিনয় করেননি। তবে নাট্যশালার ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে তাঁর অভিনয় করার কথা লিপিবদ্ধ আছে। ভাসের 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' অবলম্বনে অপরেশচন্দ্র 'বাসবদত্তা' নাটক রচনা করেন। ১৯২১ সালের ১৫ই জানুয়ারি, নাটকটি স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। নরীসুন্দরী সুসঙ্গীতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

নরীসুন্দরীর শেষ অভিনয় (আলফ্রেড মঞ্চে) মিত্র থিয়েটারে। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'শ্রীদুর্গা' নাটক ১৯২৬ সালের ২রা এপ্রিল, মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে পৃথিবীর চরিত্রে, গানে ও অভিনয়ে দর্শকদের তিনি শেষ অভিবাদন জানান। এরপর তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর

গ্রহণ করে, ধর্মজীবন যাপন করতে থাকেন।

১৯৩৯ সালের ১লা জুন (বাং ১৩৪৬, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার, আনন্দবাজার পত্রিকায় (১১ পৃঃ ৪ কলম) তাঁর লোকান্তরিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়।

প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর লোকান্তর—পরলোকে শ্রীমতী নরীসুন্দরী

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, প্রাতঃকাল অনুমান ৯॥ ঘটিকায় ভূতপূর্ব প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী নরীসুন্দরী ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বর্গীয় নটরাজ অমৃতলাল বসু পরিচালিত পুরাতন স্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী নরীসুন্দরী বহু ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম এবং রাণাপ্রতাপে মেহেরুন্নিসা, প্রতাপাদিত্যে বিজয়া, পদ্মিনীতে নসীবন প্রভৃতি ভূমিকায় শ্রীমতী নরীসুন্দরী বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অনেকদিন হইল তিনি রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম জীবন-যাপন করিতে-ছিলেন।

নরীসুন্দরীর সুদীর্ঘ ৪৭ বৎসর কালের অভিনয়-জীবনে, নাট্য-সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে, আজও তিনি কিম্বদন্তী স্বরূপ হয়ে আছেন।

স্ত্রীচরিত্রাভিনেতা ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা সাধারণ নাট্যশালার উষালগ্নে যে সব অভিনেতারা স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে যুগের অধিকাংশ শিল্পীই ছিলেন, বাগবাজারের অধিবাসী। ক্ষেত্রমোহনবাবুদেরও বাড়ি ছিল বাগবাজারের ৪৯নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে। ক্ষেত্রমোহনের পিতা মাধবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ক্ষেত্রমোহনের জন্ম বাং ১২৬৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে।

শৈশবে তিনি বাগবাজারের ভার্নাকুলার স্কুলে পড়াশোনা করেন। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) ছিলেন তাঁর সহপাঠী।

• এরপরে তিনি শিক্ষালাভ করেন আহিরীটোলার যদু পণ্ডিতের বঙ্গ বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, ফ্রী-চার্চ ইনিস্টিটিউশনে ভর্তি হন। কৈশোরকাল থেকেই তাঁর চিত্রাঙ্কনের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাই পরবর্তীকালে তিনি গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন।

প্রথম জীবনে তিনি তাঁর প্রতিবেশী, বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই কন্যা ধরাসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরীর গৃহশিক্ষক ছিলেন। নগেন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা ধরা-সুন্দরীর দুই কন্যা পরবর্তীকালের স্বনামধন্যা লেখিকা ইন্দিরা দেবী ও অনুরূপা দেবী।

ক্ষেত্রমোহনবাবু শুধু শিক্ষিত ছিলেন না, সুপুরুষও ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন খুবই মিষ্টভাষী।

নগেনবাবুর মেয়েদের তিনি যখন কবিতা পড়াতেন, তখন নগেন-বাবু লক্ষ্য করতেন, ছন্দোবদ্ধ কবিতা তিনি যখন তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে শুদ্ধ উচ্চারণসহ পাঠ করতেন, তখন যেন ঘরে একটা কাব্যময় পরিবেশ

সৃষ্টি হোত।

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, নাট্য-প্রেমিক নগেন্দ্রনাথ বঙ্গরঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাকল্পে কি অসাধারণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁর কন্যাদের গৃহশিক্ষক ক্ষেত্র-মোহনকে তাঁর সুকণ্ঠ ও সুচেহারার জন্য একদিন তাঁদের ক্লাবঘরে সঙ্গে করে নিয়ে যান। তখন তাঁদের ক্লাবে 'লীলাবতী' নাটকের মহলা চলছিল। নাট্য-শিক্ষক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নগেন্দ্রবাবুর অনুরোধে গিরিশচন্দ্র ক্ষেত্রমোহনকে 'লীলাবতী' নাটকের নায়িকা লীলাবতীর সংলাপের কিছু অংশ পড়তে দেন। গিরিশচন্দ্র ক্ষেত্র-মোহনবাবুর বাচনভঙ্গি আর সেইসঙ্গে তাঁর নির্ভুল পাঠের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, সেইদিনই তাঁকে রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য নির্বাচন করেন। 'লীলাবতী' নাটকে রাজলক্ষ্মীর চরিত্রটি ছোট। ১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসে শ্যামবাজারে বৃন্দাবন পাল লেনে, রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে 'লীলাবতী' অভিনীত হয়। ক্ষেত্রমোহন রাজলক্ষ্মীর ক্ষুদ্র চরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ প্রশংসালাভ করেন। মেয়েদের মত হাবভাব প্রদর্শনে ক্ষেত্রমোহনবাবুর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর, সান্যাল বাড়ীতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে তিনি সরলার ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন।

২১শে ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' অভিনীত হয়। এই নাটকে তিনি পাঁচীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। পাঁচী বড়লোকের বাড়ির ঝি। এই চরিত্রাভিনয়ে তিনি বড়লোকের বাড়ির ঝিয়ের এক নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তোলেন।

এরপর ন্যাশনালে দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' অভিনীত হয়। এই নাটকের নায়িকা কামিনীর চরিত্রে ক্ষেত্রমোহন এবং নায়ক বিজয়ের চরিত্রে রসরাজ অমৃতলাল অভিনয় করেন। নায়ক-নায়িকার অভিনয়

খুবই প্রাণবন্ত হয়েছিল। ক্ষেত্রমোহনের চরিত্র-চিত্রণে মুগ্ধ হয়ে দীনবন্ধু তাঁকে বলেছিলেন—"তুমি আমাব নাটকে নায়িকার জীবন দিবার জন্য জন্মিয়াছ।"

সান্যাল বাড়িতে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন থেকে, যতদিন পর্যন্ত স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করার জন্য অভিনেত্রীদের নেওয়া হয়নি, ততদিন তিনি প্রতিটি নাটকে নায়িকার অংশ গ্রহণ করে এসেছেন।

গিরিশচন্দ্রের পরিচালনায় ন্যাশনাল থিয়েটারে মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক যখন অভিনীত হয়, তখন ক্ষেত্রমোহনবাবু নাম ভূমিকায় অভিনয় কবেন। অভিনয়ের দিন মাইকেল স্বয় উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় অন্তে মাইকেল সাজঘরে এসে ক্ষেত্রমোহনকে বলেন—"Krishnakumary you have done to perfection."

এরপর ভুবন নিযোগীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রেট ন্যাশনালে প্রথমে স্ত্রীচরিত্রগুলি পুরুষদের দ্বারাই অভিনয় করানো হোত। ক্ষেত্রমোহনবাবু গ্রেট ন্যাশনালে যোগদান করে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'তে মৃণালিনী, 'কপালকুণ্ডলা'য় কপালকুণ্ডলা ও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিলোত্তমাব ভূমিকায় অভিনয় করে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। যদিও এই একই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে তখন স্ত্রীচরিত্রগুলি অভিনেত্রীদের দ্বারাই অভিনীত হচ্ছিল। তথাপি অভিনেত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অভিনেতা ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাট্যরূপায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' নাটকে ক্ষেত্রমোহন মৃণালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে, বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। গিবিশচন্দ্র মৃণালিনীর বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন, "Look, look to your Manorama, she jumps at the fire."

এরপরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো

রুপেয়া' নাটকে নায়িকার ভূমিকায় এবং হরলাল রায়ের 'হেমলতা' নাটকে হেমলতার ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন ক্ষেত্রমোহন।

বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটকের অভিনয়ে তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর করুণ রসাত্মক অভিনয় এমন প্রাণবন্ত হোত যে দর্শকেরা অশ্রু সম্বরণ করতে পারতেন না।

পরবর্তীকালে রসরাজ অমৃতলাল তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন—"মিষ্ট পার্টগুলির অভিনয়ে ক্ষেত্রবাবু ও একটু ঝাঁঝালো পার্টগুলির অভিনয়ে বেলবাবু অতুলনীয় ছিলেন।"

১৮৭৪ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয় করা শুরু করলে, ক্ষেত্রমোহনবাবু চিরতরে সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

ঢাকা বেলিয়াটি গ্রামের জমিদার ব্রজেন্দ্রকুমার রায় এই সময়ে তাঁর গ্রামে একটি সৌখীন নাট্যদল গঠন করেন।

ব্রজেনবাবু ছিলেন নাট্যরসিক। নাট্যচর্চা ও অভিনয়কলার প্রতি তিনি ছিলেন একান্ত অনুরাগী। সাধারণ নাট্যশালার সঙ্গে ক্ষেত্রমোহনবাবুর সম্পর্ক ছেদের সংবাদ পেয়ে, তিনি ক্ষেত্রমোহনবাবুকে মাসিক ১০০ টাকা বেতন দিয়ে, তাঁর নাট্যদলের নাট্য-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে তাঁর গ্রামে নিয়ে যান। প্রায় ছু'বছর বেলিয়াটি গ্রামে কাটিয়ে ক্ষেত্রমোহনবাবু ভাগ্যান্বেষণে পাটনায় (বাঁকিপুর) যান। ক্ষেত্রমোহনবাবুর বাগবাজারের প্রতিবেশী ভবনাথ সেন তখন পাটনায় কনট্রাক্টরী করতেন।

১৮৭৫ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস্ (সপ্তম এডওয়ার্ড) দিল্লীর দরবার করে পাটনায় আসেন। এই সময় ভবনাথ সেন প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর সম্বর্ধনার জন্য **Reception Ground** তৈরী করার কনট্রাক্ট পান। ভবনাথবাবু জানতেন যে ক্ষেত্রমোহন অঙ্কনবিদ্যায় পারদর্শী। তাই তিনি ক্ষেত্রমোহনবাবুকে দিয়ে **Reception Ground**-এর একটি নক্সা তৈরী করান। সরকারের নক্সাটি পছন্দ হয় এবং ক্ষেত্রমোহনবাবু

তাঁর কাজের জন্য প্রশংসিত হন।

কিছুদিন পাটনায় থাকার পর, ওখানকার প্রবাসী-বাঙ্গালীরা ক্ষেত্রমোহনবাবুর অভিনয়-প্রতিভার কথা জানতে পারেন। পাটনার বাঙ্গালীরা উদ্যোগী হয়ে সেখানে একটি নাট্যদল গঠন করেন। কিন্তু তিনি বছর দেড়েক পাটনায় কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন।

ক্ষেত্রমোহনবাবুর এক মাসতুতো ভাই চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সিমলায় **Adjutant General Office**-এ কাজ করতেন। তিনি ঐ অফিসে ক্ষেত্রমোহনবাবুকে একটি চাকরি দিয়ে সিমলায় নিয়ে যান। ক্ষেত্রমোহনবাবুর নট-জীবনের বা নাট্যচর্চার এইখানেই শেষ হয়।

ক্ষেত্রমোহনবাবুর শেষ জীবনের শ্মশ্রুশোভিত প্রতিকৃতি দেখে, আজকের নাট্যামোদীদের কাছে তিলোত্তমা কল্পনা করা অসম্ভব বলে মনে হলেও, নাট্যশালার ইতিহাস তা সত্য বলে স্বীকার করেছে।

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্যা অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের খ্যাতনামা অভিনেত্রী শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী। যাঁর অভিনয়-জীবন শুরু হয়েছিল গিরিশযুগে, আর শেষ হয়েছিল শিশির-যুগে। নীরদাসুন্দরীর জন্ম ১৮৮৯ সালে। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ১৭ বছর পরে। নীরদাসুন্দরী বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে যোগদান করার সৌভাগ্য অর্জন করে গেছেন। ১৯৭৩ সালে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। মাত্র ৯ বছর বয়সে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল। ১৮৯৮ সালে দোলের দিন ক্লাসিক থিয়েটারে 'দোললীলা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে সর্বপ্রথম তিনি সখীর দলে নেচেছেন। ১৮৯৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর, ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'নির্মলা' নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকে তিনি বাঁশরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

বালিকা বয়সে তাঁর রঙ্গালয়ে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সে যুগের নৃত্যগীত-পটিয়সী সার্থকনামা অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী। নীরদাসুন্দরীর জন্ম উত্তর কলিকাতার এক কুখ্যাত অন্ধকারাচ্ছন্ন বস্তিতে। এখন যে জায়গাটা গিরিশপার্ক নামে খ্যাত এবং যেখানে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের মর্মরমূর্তি শোভা পাচ্ছে; তখন ঐ জায়গাটাকে খোঁড়া সাহেবের বাগান বলা হোত। ঐ খোঁড়া সাহেবের বাগানে ছিল, মাটির দেওয়াল টিনের চালা দেওয়া এক বিরাট বস্তি। এই বস্তিতেই নীরদার মা তরঙ্গিণী বাস করতেন। তরঙ্গিণীকে কুসুমকুমারী দিদিমা বলতেন। তরঙ্গিণী সেই সুবাদে কুসুমকুমারীর শরণাপন্ন হন। তরঙ্গিণীর পক্ষে দাসীবৃত্তি করে মেয়েকে মানুষ করা সে সময়ে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

কুসুমকুমারী তখন নট-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অধীনে তাঁর বাগমারীর বাগান বাড়িতে বাস করতেন। সে যুগে ক্লাসিক থিয়েটারের

প্রতিষ্ঠাতা নট-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন বহু নিন্দিত ও বহু প্রশংসিত ব্যক্তি। তাঁর চরিত্রের একদিক যেমন অন্ধকারে ঢাকা ছিল, তেমনি অন্যদিকে তাঁর সৎকাজেরও অন্ত ছিল না। দীন দুঃখীদের তিনি অকাতরে অর্থ সাহায্য করেছেন। তাই কুসুমকুমারীর কাছে তরঙ্গিণীর দুঃখের কথা শুনে, অমরেন্দ্রনাথ বাগমারীর বাগানবাড়িতেই স্থান দিলেন নীরদাকে। সেইসঙ্গে নীরদার খাওয়া-পরার ভার নিলেন। আর প্রতি মাসে দশ টাকা করে নীরদার মা তরঙ্গিণীর জন্য বরাদ্দ করে দিলেন।

অমরবাবু ও কুসুমকুমারী যখন বাগানবাড়ি থেকে গাড়ি করে থিয়েটারে আসতেন, কিশোরী নীরদাও আসতেন তাঁদের সঙ্গে। নীরদার নাচ, গান ও সেইসঙ্গে অভিনয় শিক্ষা শুরু হোল ক্লাসিক থিয়েটারে। অমরবাবু ও কুসুমকুমারীর চেষ্টায় খুব অল্পকালের মধ্যেই নীরদা নাচে গানে পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন। কিন্তু অভিনয় করতে হলে যে একটু লেখাপড়া জানার দরকার, এটা অনুভব করেছিলেন নীরদা। তাছাড়া, তাঁর লেখাপড়া করার দিকে একটু ঝোঁকও ছিল, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। এখানে অমরবাবুর আশ্রয়ে এসে, নীরদা কুসুমকুমারীর কাছে তার মনের কথা ব্যক্ত করেন। অমরবাবু তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। নাচ-গান ও অভিনয় শিক্ষার সঙ্গে লেখাপড়াও চলতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে নীরদা নাটকের পার্ট মুখস্থ করার মত কিছু বাংলা লেখাপড়া শেখেন।

সাধারণতঃ সে যুগে নাট্যালয়ের শিক্ষানবিশী মেয়েরা সখীর দলে নাচতেন, নীরদাকেও সেই ভূমিকা পালন করতে হোত। তবে কখনও কখনও ছোটখাট চরিত্রে দু-চার কথা বলারও তাঁর সুযোগ এসে যেত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নীরদা, অমরবাবু ও কুসুমকুমারীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। সে যুগে অনেকের এমনও ধারণা ছিল যে নীরদাসুন্দরী কুসুমকুমারীর-ই মেয়ে।

নীরদার মা তরঙ্গিণী খুব অল্প বয়সে নীরদার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে যে কী, তখন তা বোঝবার মত বয়েসই তার হয়নি। বিয়ের

পর, ববপক্ষের অভিভাবিকা নীরদাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তরঙ্গিণী অত ছোট মেয়েকে তখন পাঠাতে চাননি। এরপর তারাও আর কোনদিন নীরদার খোঁজখবর নেয়নি। নীবদাব কাছে সে বিয়েটা ছিল পুতুলখেলাব সামিল। একট বড় হলে বিয়ে যে তাঁর হয়েছিল, একথা জানতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু কল্পনায় স্বামীর রূপ যে কেমন ছিল, তা ধারণাও করতে পাবেননি কোনদিন।

ক্লাসিক থিয়েটারেব সংস্পর্শে এসে, নীরদার নটী-জীবন সার্থক হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৮ সালেব ২৭শে আগস্ট, ক্লাসিক থিয়েটারে গিবিশচন্দ্রেব 'প্রফুল্ল' নাটকেব পুনবাভিনয় হয়, নীরদা যাদবের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই সময় থেকে ক্লাসিক থিয়েটারের প্রায় প্রতিটি নাটকেই কখনও নাচ-গান কবেছেন, কখনও বা ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। নীরদার বয়স বাড়াব সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসিকের কর্ণধার অমরেন্দ্রনাথ তাঁকে বয়সের উপযোগী ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ দিয়েছেন। ১৯০১ সালেব ৩১শে আগস্ট অমরেন্দ্রনাথ রচিত 'গুপ্তকথা' নাটক ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হয। এই নাটকে অধীরার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন নীরদা। ক্লাসিক থিয়েটারের পত্তন হয় ১৮৯৭ সালে। তার এক বছর পরে নীবদা ক্লাসিকে যোগদান করেন। ক্লাসিক থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল ১৯০৬ সাল পর্যন্ত। সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল ক্লাসিক থিয়েটার অমরেন্দ্রনাথের এক নায়কত্বে সুযশের সঙ্গে চলেছিল। আর সেই সঙ্গে বঙ্গবঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধনে তাঁর অনলস কর্মপ্রচেষ্টার কথা আজও কিম্বদন্তী স্বরূপ হয়ে আছে। ক্লাসিক থিয়েটারের অস্তিত্ব যখন লোপ পায়, নীরদার বয়স তখন ১৭ বছর। ভরা যৌবনা। এই সময়ে নীরদাকে কিছুকালের জন্য দৈনিক চারটাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এক ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছিল। নীরদা এই সময়ে রাজা গুরুদাস স্ট্রীটে একটি ঘর ভাড়া করে থাকতেন। এই ভ্রাম্যমাণ দলের সঙ্গে কখনও বা দু-চার দিন, কখনও বা পক্ষকালের জন্য দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হোত। এই

অনিশ্চিত শিল্পী-জীবনের অবসান ঘটলো ১৯১১ সালে। নীরদা মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনেত্রীর চাকুরী পেলেন। গিরিশচন্দ্র তখন মিনার্ভা থিয়েটারের নট-নাট্যকার, নাট্য-শিক্ষক এবং ম্যানেজার। নীরদা যখন থিয়েটারে যোগদান করলেন, গিরিশচন্দ্রের দেহ তখন রোগে, শোকে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনে সান্নিধ্যলাভে, নীরদার শিল্পী-জীবন ধন্য হয়ে উঠলো। ১৯১১ সালের ৮ই এপ্রিল, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঝকমারি' নামে এক হাল্কা রসের নাটকে দীপির ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করলেন। এরপর মিনার্ভায় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'রকমফের' এবং দ্বিজেন্দ্র-লালের 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'পুনর্জন্ম' মঞ্চস্থ হওয়ার পর, গিরিশচন্দ্রের 'তপোবল' নাটক ১৯১১ সালের ১৮ই নভেম্বর, মঞ্চস্থ হয়। এই 'তপোবল' নাটকে গিরিশচন্দ্র ব্রহ্মণ্যদেবের ভূমিকাটি নীরদাকে অর্পণ করেন। গিরিশচন্দ্র তখন শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিয়মিত নাটকের মহলায় যোগদান করতে পারতেন না। মিনার্ভা থিয়েটারের কর্মকর্তা তখন মহেন্দ্রকুমার মিত্র। তিনি শিল্পীদের শিক্ষালাভের জন্য গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। 'তপোবল' নাটকে ব্রহ্মণ্যদেব একটি বিশিষ্ট চরিত্র। নীরদা গিরিশচন্দ্রের কাছে শিক্ষালাভ করে ব্রহ্মণ্যদেবের চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন এবং প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন।

১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী, গিরিশচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র 'গৃহলক্ষ্মী' নামে একটি সামাজিক নাটকের চার অঙ্ক পর্যন্ত রচনা করে যান। পঞ্চম অঙ্ক রচনা করেন, গিরিশচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসু (ব্যাঙ্ বাবু)। এই নাটকটি ১৯১২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর, মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে ফুলীর ভূমিকায় আত্ম-প্রকাশ করে নীরদা বিশেষভাবে প্রশংসিত হন।

এরপর ১৯১৪ সালে 'ক্লিওপেট্রা' নাটকে চারমিয়ান ও ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'আহেরিয়া' নাটকে কেতুর ভূমিকায় অভিনয় করে, তিনি মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে, মনোমোহন থিয়েটারে যোগদান করেন।

১৯১৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর, মনোমোহনে দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠহার' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে রঙ্গিলার চরিত্রে নীরদা অপূর্ব অভিনয় করেন। এখানে একবছর কাজ করে, নীরদা পুনরায় মিনার্ভায় ফিরে যান।

১৯১৬ সালের ১৫ই জুলাই, মিনার্ভায় অপরেশচন্দ্রের 'রামানুজ' নাটক মঞ্চস্থ হয়। নীরদা চমাম্বার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটকে অভিনয় করাকালীন নীরদার জীবনে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। 'চৈতন্যলীলা'য় চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করে বিনোদিনী যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীবাদলাভে ধন্য হয়েছিলেন, তেমনি 'রামানুজ' নাটকে চমাম্বার ভূমিকায় অভিনয় করে নীরদা শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কৃপালাভ করেছিলেন।

মা সারদা দেবী ভক্ত সঙ্গে মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন 'রামানুজ' নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন।

অপরেশচন্দ্র ছিলেন মায়ের পরমভক্ত। শ্রীশ্রীমা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে অভিনয় দেখতে এসেছেন। মায়ের পদধূলিতে মিনাভা থিয়েটার সেদিন ধন্য। প্রথম তিন অঙ্কে রামানুজের ভূমিকায় অভিনয় করতেন, নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী। ৪র্থ ও ৫ম অঙ্কে রামানুজরূপে মঞ্চে আবির্ভূত হতেন, মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)। দীক্ষাদানকালে তারাসুন্দরীর ভাবের অপূব প্রকাশ দেখে, মা সারদা দেবী মুগ্ধ! প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সামগ্রিক অভিনয়ে 'রামানুজ' নাটক জীবন্ত হয়ে উঠ্তো। অভিনয় শেষ হোল। মা নীরদাকে দেখতে চাইলেন। অপরেশচন্দ্র হন্তদন্ত হয়ে সাজঘরে এসে নীরদাকে জানালেন, 'মা এসেছেন, যা শিগ্গীর ওপরে যা।'

মা? কোন্ মা? নীরদা সবিস্ময়ে চেয়ে থাকেন অপরেশচন্দ্রের মুখের দিকে।

'কিরে! অমন করে চেয়ে আছিস্ কেন মুখের দিকে? মাকে জানিস্ না? মা সারদা দেবী। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী।'

অপরেশচন্দ্রের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীরদা চমাম্বার পোশাক পরেই ছুট্‌লো ওপর তলায়। মা নীরদাকে দেখে সস্নেহে বলেন—'এসো মা, চমাম্বা এসো।'

নীরদা মাকে প্রণাম করে। মা তাকে কোলে টেনে নেন। চুম্বন করেন। মায়ের আশীর্বাদ বর্ষিত হয় নীরদার শিরে। নীরদার নটী-জীবন আজ ধন্য! নীরদার দু'চোখ তখন অশ্রুধারায় অভিষিক্ত!

অপরেশচন্দ্র ১৩৩১ সালের 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রঙ্গভূমি' নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন—"মানুষ খোলটা দেখে। ভগবান খোলের ভিতরটা দেখেন, আর ভিতরটা দেখেন বলিয়াই আমি দেখিয়াছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-জননী মা আমার, এই দেশের রঙ্গালয়ের কোনো পতিতা অভিনেত্রীকে কোলে করিয়া জগৎ দেখাইয়া গিয়াছেন—ভগবানের দয়া কাঁটা গাছকে বাছে না—সে দয়ার পাত্রপাত্রী নাই, সে দয়া বিচার করে না, ব্যব-হারিক জগতের কোনো বিধিনিষেধ মানে না; সে কেবল জাতি-নির্বিচারে সকলকে পবিত্র করিয়া লয়।"

এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল বিনোদিনীর মস্তকে, তা ভক্তিভাবের রসসৃষ্টির জন্য। আর মা সারদা দেবী নীরদাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, কলহ-পরায়ণা লক্ষ্মণের স্ত্রী চমাম্বার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য। দুই বিপরীত চরিত্রে দুই বার-নারী অভিনয় করে, দুর্লভ আশীর্বাদের অধিকারিণী হয়েছিলেন। অপরেশচন্দ্রের সার্থক উক্তি—"ভগবানের দয়া কাঁটা গাছকে বাছে না।"

১৯১৮ সালে মিনার্ভায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'কিন্নরী' নাটক মঞ্চস্থ হোল ১৭ই আগস্ট। নীরদা নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করে নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন।

১৯২১ সালে ম্যাডান কোম্পানী বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানী নামে একটি নতুন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যশালার নবযুগের

প্রবর্তক নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সর্বপ্রথম এই বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানীতে নট ও নাট্য-পরিচালকরূপে যোগদান করেন।

১৮৭২ সাল থেকে সাধারণ রঙ্গালয় যে খাতে প্রবাহিত হয়ে আসছিল, শিশিরকুমার তার আমূল পরিবর্তন করলেন। অভিনয়ে ও প্রয়োগরীতিতে তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেন। নাট্যামোদী দর্শকেরা এতকাল যেন এইটাই চাইছিলেন। তাঁরা স্বাগত জানালেন শিশিরকুমারকে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর' নাটক বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানীতে মঞ্চস্থ হোল— ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর। এই সময়ে শিশির সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ এসে গেল নীরদার। 'আলমগীর' নাটকে তিনি প্রথমে সুজাতার ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরে আলফ্রেড্ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার যখন 'আলমগীর' নাটক মঞ্চস্থ করেন, তখন নীরদা বীরাবাঈ-এর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি 'আলমগীর' নাটকে শিশিরকুমারের সঙ্গে উদিপুরীর ভূমিকাতেও অভিনয় করেছেন।

১৯২৬ সালে শিশিরকুমার মনোমোহন থিয়েটারে 'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটক নিয়ে ৬ই আগস্ট, নাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। নীবদা 'সীতা' নাটকে শম্বুক পত্নী তুঙ্গভদ্রার ভূমিকায় অভিনয় করেন। শ্রীরামচন্দ্রকে অভিশম্পাত প্রদানকালে নীরদার বাচনভঙ্গী ও অভিব্যক্তি দর্শকদের অভিভূত করে তুল্তো। সে সময়কার প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় নীরদার অভিনয় সম্পর্কে প্রশংসা করা হয়।

'সীতা' নাটকের অভিনয় চলাকালীন মধ্য সাপ্তাহিক নাটকরূপে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' নাটক শিশিরকুমারের প্রয়োগ নৈপুণ্যে নাট্য-মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। এই নাটকে নীরদা সত্যবতীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। ১৩৩১ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ, 'নাচঘর' পত্রিকায় 'ভীষ্ম' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়—

"……শ্রীমতী চারুশীলা ও শ্রীমতী নীরদাসুন্দরীর অভিনয় অপূর্বভাবে উপভোগ্য ও উচ্চশ্রেণীর যোগ্য হয়েছিল।"

নীরদার নটী-জীবনের হাতেখড়ি অমরেন্দ্রনাথের কাছে। অভিনয় জীবনের ব্যাপ্তি ঘটেছিল নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায়। পরবর্তীকালে নবনাট্য-যুগের প্রবর্তক শিশিরকুমারের কাছে তাঁর অভিনয়-জীবনের পরিমার্জিত রূপটি প্রকাশ পেয়েছিল। এক সময় তিনি নাচে, গানে ও অভিনয়ে দর্শকচিত্ত জয় করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই ব্যালে নীরদা, গায়িকা নীরদার কথা দর্শকেরা ভুলে গিয়েছিল, দর্শকদের কাছে তখন তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়ে উঠেছিল সুঅভিনেত্রীরূপে।

১৯৩১ সালে নাট্যনিকেতনে তিনি এমন এক নতুন ধবনের নাটকে অংশ গ্রহণ করলেন, যে নাটক বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে দিক্‌চিহ্নরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৪ই নভেম্বর, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে' মঞ্চস্থ হোল। সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত কলাকুশলী সতু সেন নাটকটির প্রয়োগকর্তারূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। একটি মাত্র দৃশ্যে তিন ঘণ্টার নাটক সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হোল বঙ্গরঙ্গমঞ্চে। জল, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুতের ঝলকানি, মোটরের হর্ন এবং সর্বোপরি আলোক-সম্পাতের কলাকুশলতায় 'ঝড়ের রাতে' দর্শকদের বিস্ময়ে অভিভূত করে তুললো। এই নাটকে নীরদা মাসিমার ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত নীরদা নাট্যনিকেতনে অভিনয় করে, ১৯৩৫ সালে নতুন-বাজারের কাছে রূপমহল (রঙ্গমহল) নামক একটি নবনির্মিত নাট্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালের ৩০শে নভেম্বর, শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের 'আবুল হাসান' নাটক মঞ্চস্থ হয়। সে যুগের সর্বজনপ্রিয় নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটির পরিচালনা করেন। এই নাটকে নীরদা একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করে, বিশেষভাবে প্রশংসিত হন।

১৯৪২ সালে তিনি পুনরায় মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি সুদীর্ঘকাল মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করেছেন। ১৯৪৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' মঞ্চস্থ

হয়। আমি 'কাশীনাথে'র নাট্যরূপ প্রদান করি। এই সময়ে শ্রীমতী নীরদাসুন্দরীর সঙ্গে আমার পরিচয়লাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়। এই নাটকে প্রথম কয়েক রাত্রি হরির মা'র চরিত্রে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী অভিনয় করেন। সুহাসিনী দেবী শারীরিক অসুস্থতার কারণে অভিনয় করতে অক্ষম হলে, নীরদাসুন্দরী হরির মা'র চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে নীরদাসুন্দরী বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমি সে যুগের অভিনয় প্রসঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতাম। দেখেছি, অমরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের প্রতি তিনি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বলতেন, "অমরবাবুব দয়ায় ও যত্নে আমি আজও দু'মুঠো খেয়ে পরে বেঁচে আছি। অমরবাবুর মত হৃদয়বান মানুষ আজ পর্যন্ত আমি থিয়েটারে আর কাউকে দেখিনি। আর গিরিশচন্দ্রের কথা কী বলবো—তাঁর মত ভাগ্য থিয়েটারে আর ক'টা লোকেব হয়েছে ? তিনি ছিলেন ঠাকুরের দামাল ছেলে। যেন বাপ-ব্যাটা। ঠাকুর, ব্যাটার সব দোষ ক্ষমা করে তাঁকে পায়ে স্থান দিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর দোষ ধরতেন, তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে ঠাকুর 'ভৈরব' বলে তাঁকে চিনিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি যখন ক্লাসিক থিয়েটারে ছোটবেলায় আসি, তখন তিনি আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, কত স্নেহ দিয়ে আমার মুখ থেকে কথা বলিয়েছেন। মিনার্ভায় 'তপোবল' নাটকে আমায় বড় পার্ট দিয়ে আমাকে লোকের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

আমি যখন ন'বছর বয়েসে থিয়েটারে আসি, তার অনেক আগেই ঠাকুর দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর কৃপার কথা শুনেছি। তাঁর ভৈরবের চরণতলে বসে শিক্ষালাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল বলেই হয় তো মা সারদা দেবী আমায় কৃপা করেছিলেন। আদরে কোলে স্থান দিয়ে চুমু খেয়েছিলেন। একি আমার কম সৌভাগ্য দাদা ভাই!" কথাগুলো বলতে বলতে কতদিন নীরদাসুন্দরীর দু'টি চোখ জলভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে দেখেছি।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীতে গিরিশ জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনি একবার বক্তৃতা করেছিলেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, গিরিশচন্দ্রেব নাট্য-শিক্ষাদান সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। সেদিন অপূর্ব বক্তৃতা করেছিলেন নীরদা। মধ্যে মধ্যে 'তপোবল' নাটকের ব্রহ্মণ্যদেব চরিত্রের কিছু কিছু সংলাপ আবৃত্তি করে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন. তাঁকে গিরিশচন্দ্র কী ভাবে এই চরিত্রে অভিনয় করতে শিখিয়েছিলেন।

প্রথম জীবন এবং শেষ জীবনে তিনি অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে গেছেন। প্রথম জীবনে আশ্রয় পেয়েছিলেন অমরবাবুর কাছে· আর শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হারিয়ে তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তার কাছে। শান্তি গুপ্তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর থাকা, খাওয়া-পরা ও রোগের চিকিৎসা করার সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণ কবেছিলেন। তিনি জরাগ্রস্ত হয়ে বেঁচেছিলেন বোধহয় নাট্যশালাব শতবর্ষ উৎসব পালন করার জন্য। নাট্যশালার শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে আমি তাঁকে ১৯৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর, স্টার থিয়েটারে নিয়ে এসেছিলাম। এর কয়েক মাস পরে ১৯৭৩ সালে নীরদাসুন্দরী সংসার-মঞ্চ থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করেন।

নট-নায়ক অপরেশচন্দ্র

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বঙ্গরঙ্গভূমির এক প্রবাদ পুরুষ। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল তিনি একনিষ্ঠভাবে রঙ্গভূমির সেবা করে গেছেন। তাঁকে দেখা গেছে কৃতী নট ও নাট্যকার রূপে। সর্বোপরি রঙ্গালয়ের পরিচালনার কাজে তাঁর অসামান্য দক্ষতার কথা রঙ্গমঞ্চের মানুষদের কাছে আজও কিম্বদন্তীস্বরূপ হয়ে আছে।

তাঁর অভিনয়-জীবন শুরু হয়েছে ১৯০৫ সালে, ২৯ বছর বয়সে। অবশ্য ১৬ বছর বয়স থেকেই তিনি অভিনয়কলার প্রতি আকৃষ্ট হন। এক সৌখীন নাট্যদলের সঙ্গে আকস্মিকভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে তিনি স্মৃতিকথায় উল্লেখ করে লিখেছেন—

"বয়স যখন বছর ষোল, একদিন পথে বাহির হইয়াছি, এক বাল্যবন্ধুর সহিত দেখা হইল। অনেকদিন পরে দেখা। দুই একটি কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোথায় যাচ্ছিস ?'

সে বেশ গর্বের সঙ্গে একটু গম্ভীর কণ্ঠেই বলিল—'আড্ডায়।'

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আড্ডা! কিসের আড্ডা ? গাঁজার নাকি ?'

সে হাসিয়া বলিল—'দূর, তা কেন ? থিয়েটারের।'

'থিয়েটারের ? পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিস নাকি ?'

'ছাড়ব কেন ? কলেজেও যাই। থিয়েটারও করি।'

'বটে ? তোর এতদূর উন্নতি হয়েছে ?'

আমি সত্যই অবাক হইয়া গেলাম; কারণ বন্ধুটি আমার ছিল নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে এবং একান্ত পাঠানুরাগী। আমাদের কথা হইতেছে, এমন সময় পিছন দিক হইতে কে বলিয়া উঠিল—'বাবু কেতনা ঘড়ি দের করেগা ?'

চাহিয়া দেখি, পশ্চাতে এক ঝাঁকা মুটে; তাহার ঝাঁকায় বাঁয়া ও

তবলা। বন্ধুটি নিজের কথার প্রমাণস্বরূপ মুটের মাথায় বাঁয়া-তবলা দেখাইয়া বলিল—'এই দেখ, বাঁয়া-তবলা, আড্ডায় বাজান হয়। জোড়াসাঁকোয় ছাইতে দিয়েছিলাম, নিয়ে যাচ্ছি। তুই কোথায় যাচ্ছিস ?

আমি বলিলাম—'বেড়াতে।'

'আর বেড়াতে যায় না, আমাদের আড্ডা দেখে আসবি চল্।'

এইরূপ আড্ডার প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিল। পড়াশুনা করি আর নাই করি, পাঁচিলে বসিয়া থিয়েটার দেখা, 'ভীমচক্র' করা, গঙ্গার ধারে বেড়ান, কিম্বা জয়দেব মুখস্থ করা ভিন্ন অন্য বদ্‌খেয়াল আমাদের ছিল না। এ বয়স পর্যন্ত অসৎ সঙ্গে কখনও মিশি নাই! আড্ডার কথা শুনিয়াই, ঘৃণা ও উপেক্ষার সহিত বলিলাম—'আড্ডায় আবার ভদ্রলোকে যায় ?'

বন্ধুটি বেশ সহজ এবং অকপটভাবেই বলিল—'নারে, সে রকম আড্ডায় নয়। সত্যিই ভদ্রলোকের আড্ডা। কেউ নেশাখোর বা ছোট-লোক নেই, সবাই ভদ্রলোক, সবাই শিক্ষিত। তাস পাশা না খেলে বিকেলে ঘণ্টা দুই করে এ্যাক্‌টিং-এর চর্চা করা যায়, মন্দ কি ?'

আজিকালিকার মত থিয়েটার করাটা তখন আর্টের চর্চা বলিয়া কথিত হইত না। থিয়েটার বিশ্ববখাটেরাই করিত—যাক্ সে কথা।...

আমরা কথা কহিতেছি, এদিকে মুটে ক্রমশঃ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; সে আর দাঁড়াইতে চাহে না। বন্ধুটি বলিল—'চ না, কথা কইতে কইতে যাই, বেশি দূরে নয়।'

অধঃপতনের পথ সত্যই 'বেশি দূরে নয়'। পা পা করিয়া অগ্রসর হইলাম। পাঁজি দেখি নাই, তবে সেদিন নক্ষত্র যে আমার পক্ষে শুভ ছিল না, জীবনে তা নির্ভুলরূপে সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে।"

অপরেশচন্দ্রের থিয়েটারের আড্ডায় প্রাথমিক প্রবেশের ইতিহাস এইটুকু হলেও তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখা শুরু করেছেন, কৈশোরের ক্রান্তিকালে। এর প্রমাণ তাঁর স্মৃতিচারণেই মেলে। তিনি

লিখেছেন— "...তখনকারবেঙ্গল থিয়েটারের পশ্চিমে একটা ভাঙ্গা পাঁচিল ছিল। পাঁচিলটি একজন হাড়ী কি ডোমের বাড়ীর সীমানায়, সেই পাঁচিলের উপর হইতে থিয়েটারের ভিতরের সব দেখা যাইত। আমরা পাঁচিলের মালিক এক বৃদ্ধাকে দুইটি করিয়া পয়সা দিয়া তিন চারিজনে মিলিয়া থিয়েটার দেখিতাম।"—এই নেশা আর পরবর্তীকালে আড্ডায় মেশা, এই দুইয়ে মিলে, শেষ পর্যন্ত তাঁর সমগ্র জীবনটি নাট্যশালার চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ হয়েছিল।

১৬ বছর বয়েস থেকে এই অভিনয়ের নেশা, শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখাপড়া শেখার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। এ সম্পর্কেও তিনি অকপটে লিপিবদ্ধ করেছেন। লিখেছেন– "নিতান্ত অনিচ্ছায় এইরূপ অভাবনীয়ভাবে আমি সেইদিন সেই আড্ডারূপ 'যমদ্বারে মহাঘোরে' প্রবেশ করিয়াছিলাম। সেইদিন হইতেই আমিও ইহার একজন নিয়মিত সভ্য হইয়া গেলাম এবং তাহারই ফলে সেই বৎসরে– এই ঘটনার প্রায় মাস পাঁচেক পরে, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়া, অঙ্কের খাতায় একান্ত অনন্যোপায় হইয়াই দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের প্রায় সমস্ত ইংরাজী বুকনিগুলি লিখিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম।"

পড়াশোনায় এইভাবে ইস্তফা দিয়ে অপরেশচন্দ্র নাটক নিয়ে মেতে উঠলেন। কখনো তাঁদের আড্ডায় 'পলাশীর যুদ্ধ', কখনো বা 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' প্রভৃতি নাটকের মহলা চলে। এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটানোর পর, তাঁরা 'বীণা' রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে পাবলিক থিয়েটার করার পরিকল্পনা করেন। থিয়েটারটির নাম দেওয়া হয় 'প্যাণ্ডোরা থিয়েটার'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্যাণ্ডোরা থিয়েটার পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। এরই মাঝে কিছুদিন রেল ও সওদাগরী অফিসে কাজ করেন। কিন্তু সে চাকরি করার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। শুধু পিতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তা বর্জন করতেও তাঁর বেশি

সময় লাগেনি।

ইতিমধ্যে সে যুগের একচ্ছত্র নায়ক মহেন্দ্র বসুর কাছে অভিনয়-শিক্ষার তালিম নিয়েছেন। অমৃত মিত্রের ন্যায় সে যুগের প্রথিতযশা শিল্পীর সান্নিধ্যে এসেছেন। কয়েকবার নড়াইল রাজবাড়িতে শখের থিয়েটারে অভিনয় করেছেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর বরাবরই অনুরাগ ছিল। ইতিমধ্যে 'প্রয়াস' ও 'প্রভাকর' পত্রিকায় কিছু কিছু নিবন্ধও রচনা করেছেন।

মনোমোহন পাঁড়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। প্যাণ্ডোরা থিয়েটার চালু করার জন্য অপরেশচন্দ্রের অনুরোধে তিনি কিছু ঋণও দিয়েছিলেন একসময়।

১৯০৩ সালে মনোমোহনবাবু বড়দিনের আসরে, আট রাত্রির জন্য মিনার্ভা থিয়েটারের মালিকদের কাছ থেকে হাউস কিনে নেন। এই আট রাত্রির টিকিট বিক্রয়ের ভার দেন তাঁর বন্ধু অপরেশচন্দ্রকে। এই আট রাত্রির বিক্রয়লব্ধ অর্থে খরচখরচা বাদ দিয়ে তিনি বেশ কিছু মোটা টাকা মুনাফা করেন। ইতিপূর্বে মনোমোহনবাবু কখনো কখনো থিয়েটারের মালিকদের ঋণ দিয়েছেন। কিন্তু থিয়েটারের ব্যবসায় নামেননি। কিন্তু আটদিনের টিকিট বিক্রয়ের মুনাফার মোটা অঙ্ক দেখে, এবার তিনি পুরোপুরি থিয়েটারের ব্যবসা শুরু করবেন বলে মনস্থ করলেন।

অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে মনোমোহনবাবুর ঘনিষ্ঠতা হয় নড়াইল রাজ-বাড়িতে অভিনয় করার সূত্রে। নড়াইল রাজবাড়ির সৌখীন দলটির নাম ছিল, ইলিসিয়াম থিয়েটার। অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন এই সম্প্রদায়ের নাট্য-শিক্ষক। তাঁর শিক্ষাধীনে অপরেশচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' নাটকে প্রতাপ-ও 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেন। বলা যেতে পারে, অপরেশচন্দ্রের প্রকৃত নটগুরু ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর।

এই সময় নট-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত একযোগে ক্লাসিক ও

মিনার্ভা থিয়েটার চালাচ্ছিলেন। আর্থিক প্রয়োজনে তিনি মনোমোহন-বাবুর কাছে একসময়ে কিছু টাকা ঋণ করেছিলেন। কিন্তু সময়মত কিস্তির টাকা শোধ করতে না পারায়, ১৯০৪ সালের ২৭শে জুলাই অমরেন্দ্রনাথ মনোমোহনবাবুর নামে মিনার্ভা থিয়েটারের লীজ দুই বৎসরের জন্য লিখে দেন।

মনোমোহনবাবু মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালনার সুযোগ পাওয়ার পর, অপরেশচন্দ্রকে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে আসেন। এখানেই তিনি সর্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯০৪ সালে 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমার, 'সংসার' নাটকে প্রিয়নাথ এবং 'জনা'য় প্রবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এর কিছুদিন পরেই স্টার থিয়েটার থেকে অর্ধেন্দুশেখর এবং ইউনিক থিয়েটার থেকে তারাসুন্দরী মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। এরপর ডিসেম্বর মাসে ক্লাসিক থিয়েটার থেকে গিরিশচন্দ্রও মিনার্ভায় আসেন। গিরিশচন্দ্র মনোমোহন-বাবুর মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান কবার পর, ১৯০৫ সালে 'হরগৌরী' এবং ঐ বছরেব ২রা এপ্রিল, 'বলিদান' নাটক মঞ্চস্থ হয়। 'বলিদান' নাটকে অপরেশচন্দ্র কিশোরের চরিত্রে রূপদান করেন। অভিনয় করা ছাড়াও এই সময় অপরেশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটায়ের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। থিয়েটারের ব্যবসা পরিচালনার কাজে অপরেশচন্দ্রের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হয়, এই সময় থেকেই। যাই হোক, 'হর-গৌরী' ও 'বলিদান' নাটকের অভিনয়ে আশানুরূপ অর্থাগম না হওয়ায়, গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনা করেন। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে নামভূমিকায় অপরেশচন্দ্রকে অভিনয় করার সুযোগ দেওয়ার জন্য মনোমোহনবাবু গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এ অনুরোধ রক্ষা করেননি। তিনি তাঁর পুত্র দানীবাবুকে সিরাজের পার্ট দেন। অভিমানবশে অপরেশচন্দ্র মিনার্ভার সংশ্রব ত্যাগ করেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে সেদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর কখনো পেশাদার রঙ্গালয়ে অভিনয় করবেন না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রতি

সেদিন অভিমান করলেও, তাঁর প্রতি কোনোদিন শ্রদ্ধার অভাব হয়নি অপরেশচন্দ্রের। বরং বলা চলে, সে যুগে অনেকের চেয়ে তিনি গিরিশচন্দ্রের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন—"নাট্যবাণীর বরপুত্র গিরিশচন্দ্র ইহার সেই মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। তাঁহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল, কেবলমাত্র প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ —ইহার অন্ন—নাটক। গিরিশচন্দ্র এ দেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে -তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবব স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পবিপুষ্ট কবিয়াছিলেন। ইহার মজ্জায় মজ্জায় বস সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of Native Stage —ইহার খুড়া-জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিল না। ইহা এক প্রকার বেওয়ারিশ অবস্থায় টলিতেছিল, পড়িতেছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল। যে অমৃতপানে বাঙ্গালার নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অমৃতভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাঙ্গালা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা তিনিই।"

অপরেশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেও, শেষ পর্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা তাঁকে ভঙ্গ করতে হয়েছিল। ১৯০৬ সালে এ্যামেচার অভিনেতারূপে স্টার থিয়েটারে যোগদান করে 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে মোহনলালের ভূমিকায় সুযশের সঙ্গে অভিনয় করেন। ১৯০৭ সালে কোহিনূর থিয়েটারে অভিনেতা ও সহকারী ম্যানেজাররূপে যোগদান করেন। এরপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন।

তাঁর অভিনয়-জীবন প্রধানতঃ কোহিনূর, মিনার্ভা ও স্টার থিয়েটারের মধ্যে আবর্তিত হয়েছিল। এর মধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারে

তাঁর নট-জীবনের যেমন ব্যাপ্তি ঘটেছে, তেমনি নাট্যকাররূপেও তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ১৯২০ সালে তিনি নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরীর সহায়তায় স্টার থিয়েটারের লেসী হন। এই সময় থিয়েটারের প্রয়োজনে তাঁকে অসংখ্য নাটক রচনা করতে হয়েছে। নাট্য-শিক্ষকের তথা নাট্য-প্রযোজকের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। সর্বোপরি থিয়েটারের ব্যবসায়িক দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। তাঁর শিক্ষাধীনে এইসময়ে কিছু নতুন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। নাট্য-রচনায়, অভিনয়ে ও প্রযোজনায় স্টার থিয়েটারের এই সময়ে সুনাম বৃদ্ধি হয়।

১৯২১ সালে ম্যাডান কোম্পানা, বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী নামে বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার অধ্যাপনা ত্যাগ করে, সর্বপ্রথম পেশাদার নটরূপে ম্যাডানের থিয়েটারে যোগদান করেন। পঞ্চাশ বছর সাধারণ রঙ্গালয় যে ভাবমূর্তি নিয়ে চলে আসছিল, শিশিরকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবমূর্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হলো। কী অভিনয়ে, কী প্রয়োগ পদ্ধতিতে, শিশির-কুমার এক অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন। সবশ্রেণীর দর্শকবৃন্দ শিশিরকুমারকে স্বাগত জানালেন। বঙ্গরঙ্গালয় বিগত পঞ্চাশ বছর যে গতানুগতিক পথ ধরে চলে আসছিল, শিশিরকুমার তার রূপ ও রীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করলেন। দর্শক সাধারণও যেন এতদিন এটাই প্রত্যাশা করছিলেন।

অপরেশচন্দ্র যে যুগে নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তখন যেসব নাট্যরথী, মহারথীদের সংস্পর্শে আসার তার সুযোগ হয়েছিল, এতকাল তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি চলেছিলেন। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পর, তিনি বুঝেছিলেন যে, দিন বদলের পালা শুরু হয়েছে। অপরেশচন্দ্রের মধ্যে গোঁড়ামি ছিল না। তিনি যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে জানতেন। তাই নতুন পথ ধরে চলাই তিনি শ্রেয়ঃ মনে করলেন। আর সেই সঙ্গে থিয়েটারটিকে নতুন ধাঁচে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করলেন। পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তোলার মত অর্থ তখন তাঁর

হাতে ছিল না। তাই ১৯২৩ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি, তিনি স্টার থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য আসবাব পঁচিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ হলেন স্টার থিয়েটারের পরিচালক। প্রবোধচন্দ্র গুহ হলেন সেক্রেটারী। আর অপরেশচন্দ্র হলেন ম্যানেজার। মাসিক মাইনে ধার্য হলো পাঁচ শত টাকা। ১৯২৩ সালের ৩০শে জুন, অপরেশচন্দ্রের নতুন নাটক 'কর্ণার্জুন' মঞ্চস্থ হলো। গিরিশযুগের নাট্য-রচনা-রীতির কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না 'কর্ণার্জুনে'। কিন্তু প্রয়োগ নৈপুণ্যে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। আর সেই সঙ্গে নাট্য-জগতে উপহার দিলেন, নতুন এক শিল্পীগোষ্ঠী।

১৯২৩-১৯৩৩ সাল পর্যন্ত আর্ট থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি বহু সুপ্রযোজিত নাটক উপহার দিয়েছেন রঙ্গরসিক সুধীবৃন্দকে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অপরেশচন্দ্রই আর্ট থিয়েটারের পতাকাতলে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করে সুনাম অর্জন করেন। এ সম্পর্কে ১৩৩২ সালের ৫ই ভাদ্র 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয় –"রবীন্দ্রনাথ এবার পাঁচ ছ'খানি নতুন নাটক লিখছেন। নাট্যজগতের কাছে এ এক পরম আনন্দ সংবাদ। আশা করি এইবার বাংলার সমস্ত রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি অভিনয় হতে শুরু হবে। এই আশাতীত সৌভাগ্যের জন্য আমাদের সমস্ত কৃতজ্ঞতা আর্ট থিয়েটারের প্রাপ্য! কারণ তাঁরাই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে জমিয়ে তুলেছেন।" বলা বাহুল্য, আর্ট থিয়েটারে অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। অপরেশচন্দ্র রসিকের চরিত্রে অভিনয় করে কবির প্রশংসাভাজন হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'রসিকবাবু' বলে সম্বোধন করেন।

শিশিরকুমারের অভ্যুদয়ের কাল থেকে অপরেশচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্যন্ত নতুন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে বঙ্গরঙ্গজগতে এক গৌরবময়

অধ্যায় সূচিত হয়েছিল।

নাট্য-রচনায় অপরেশচন্দ্র ছিলেন গিরিশচন্দ্রের উত্তরসূরী। নাটকের সংলাপ রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নাটককে প্রারম্ভ, পুষ্টি ও পরিণতির পথে, ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি ৩০টি নাটক রচনা করে গেছেন। এর মধ্যে ইংরেজী নাটকের ভাবাবলম্বনে রচিত নাটক আটটি, সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে রচিত নাটক তিনটি, উপন্যাসের নাট্যরূপ চারটি। এ ছাড়া অসংখ্য প্রবন্ধ ও একটি উপন্যাস রচনা করে গেছেন। তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামক (স্মৃতিকথা) গ্রন্থটি বঙ্গরঙ্গভূমির ইতিহাসের অন্যতম দলিল রূপে সর্বজন সমাদৃত।

নট-নায়ক অপরেশচন্দ্র বাং ১২৮২ সালের ৪ঠা শ্রাবণ (ইং ১৮৭৫, ১৯শে জুলাই) নদীয়া জেলার মহেশপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৪১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯৩৪, ১৫ই মে) ৫৯ বছর বয়সে তিনি উত্তর কলিকাতার মহেন্দ্র মিত্র লেনে পরলোকগমন করেন।

তাঁর পরলোকপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গিরিশযুগের শেষ ধারক ও বাহকের অভাব অনুভূত হতে থাকে।

নট-নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে যাঁর অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়, সেই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বর্তমানে স্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। অথচ নগেন্দ্রনাথই ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পুরোধা। ১৩৩৫ সালের 'মাসিক বসুমতী'তে ভুবনমোহন নিয়োগীর স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু লেখেন—"আমি পেছন দিকে ফিরে যতবারই ভেবেছি, আমার মনে হয়েছে যে, সে সময়ে ৪টি লোক না থাকলে, এদেশে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হতে পারত না। সেই ৪টি লোক হচ্ছে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃসিদ্ধ যেগাড়ে অর্থাৎ অর্গানাইজ করবার অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী এবং একজন বিশিষ্ট নট। ধর্মদাস সুর যোগাড়ে নগেনের সহায় এবং হাতের কাজে বিশেষ পটু। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—বিধাতার হাতে গড়া একটর ও অতুলনীয় নাট্য শিক্ষক, অর্ধেন্দু ছিল সেইরকম মাস্টার, যিনি কোন ছেলেকে বলেন না যে, তোর কিছু হবে না ; একটা দু'কথার পাটের ভিতরেও মনে রাখবার মতন ছবি ফুটিয়ে দিতে সমর্থ। আর ভুবনমোহন নিয়োগী যাঁর সাহায্যে প্রথম এক দল বসবার জায়গা পাই ও পরে যাঁর টাকায় বিডন স্ট্রীটে একটা সুদৃশ্য নাট্যশালা স্থাপিত হয়।"

আবার অমৃতলাল তাঁর পুরাতন-প্রসঙ্গ ২য় পর্যায়ে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন—"অর্ধেন্দু ছিলেন আমাদের **general master,** কিন্তু সব বিষয়েই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

নগেন্দ্রনাথের উদ্যোগেই যে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা যখন করা হয়, তখন নটগুরু গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে, 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত-

করেন। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর, জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হলো দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক নিয়ে। বিজ্ঞাপনে নগেন্দ্রনাথের নাম প্রচারিত হলো ন্যাশনাল থিয়েটারের সেক্রেটারীরূপে। 'নীলদর্পণ' নাটকে নগেন্দ্রনাথ নবীন মাধবেব ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন। পববর্তী কালে রসরাজ অমৃতলাল 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম রাত্রির অভিনয় প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করে নগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন— "...বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সুপুরুষ নগেন্দ্রনাথকে, নবীনমাধবেব ভূমিকায় যেমন মানাইয়াছিল, তেমন নবীনমাধব আর জীবনে দেখি নাই।" বহুবাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে, বন্ধুদের সাহচর্যে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে, নগেন্দ্রনাথ তাঁর সাংগঠনিক শক্তির দ্বারা যে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে অচিরেই তা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়।

একদলে ধর্মদাস সুর গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে এসে দল গড়লেন। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে সঙ্গে রইলেন গোপাল দাস, শিব ভট্টাচার্য, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। গিরিশচন্দ্র তাঁর দলকে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে রেজিস্ট্রী করলেন।

অন্য দলের পুরোভাগে রইলেন নগেন্দ্রনাথ। নাট্য-শিক্ষকরূপে যোগ দিলেন অর্ধেন্দুশেখর। শিল্পীরূপে যুক্ত হলেন অমৃতলাল বসু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁরা দলের নামকরণ করলেন 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার'।

এই দুই দল কখনো কলকালতায়, কখনো মফঃস্বলের নানা শহরে অভিনয় করে বেড়াতে লাগলেন। এরই মাঝে ভুবনমোহন নিয়োগীর সহায়তায় নগেন্দ্রবাবু ও ধর্মদাসবাবু বিডন স্ট্রীটে (বর্তমানে মিনার্ভা থিয়েটার যেখানে অবস্থিত) 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়ে একটি স্থায়ী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রের সহায়তায়

'কাম্যকানন' নামে এক নাটক রচনা করেন। ১৮৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, 'কাম্যকানন' নিয়ে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ইতিপূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয় শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার স্ত্রীচরিত্রগুলি তখনো পুরুষদের-দ্বারাই অভিনয় করাতে লাগলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় ওঁরা কিন্তু পেরে উঠলেন না। শেষ পর্যন্ত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনেত্রী নিয়েই অভিনয় করা স্থির করলেন এবং ছয়জন অভিনেত্রী নিযুক্ত করলেন। এঁরা হলেন—যাদুমণি, রাজকুমারী, হরিদাসী (অর্থাৎ বড়হরি), কাদম্বিনী, লক্ষ্মীমণি ও ক্ষেত্রমণি। আর সেই সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজারের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এই সময়ে নগেন্দ্রনাথ 'সতী কি কলঙ্কিনী' নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। ১৮৭৪ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর 'সতী কি কলঙ্কিনী' মঞ্চস্থ হয়। এই অপেরাধর্মী নাটকটি সে যুগে দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। নাট্যশালার গোড়ার যুগে 'সতী কি কলঙ্কিনী' বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার অভিনীত হয়েছে।

'সতী কি কলঙ্কিনী ?' সম্পর্কে ১৩৩৭ সালের শারদীয় নাচঘর পত্রিকায় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন—"স্ত্রী-'অভিনেত্রী প্রবর্তনে এবং সঙ্গীতাচার্য্য মদনমোহন বর্মণের সুমধুর সুরসংযোজনে 'সতী কি কলঙ্কিনী' আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। যাদুমণি রাধিকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি যেরূপ সুকণ্ঠী সেইরূপ সুগায়িকা ছিলেন। বেশি দিন ইনি থিয়েটারে ছিলেন না। মাসিক দুইশত টাকা বেতনে ইনি সুপ্রসিদ্ধ, গুণগ্রাহী ও উদারচেতা স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে গান শোনাইতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল।"

'সতী কি কলঙ্কিনী'র অভিনয় চলাকালীন ভুবনমোহন নিয়োগীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের মনান্তর ঘটে। তিনি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার

মানুষ ছিলেন না নগেন্দ্রনাথ। তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ছিল অপরিসীম। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী', নাম নিয়ে মফঃস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনয় করে ১৮৭৫ সালে বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৭৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী 'সতী কি কলঙ্কিনী' মঞ্চস্থ করেন। নগেন্দ্রনাথেব রচিত 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকটি বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রথম অপেবা নাটক। দ্বিতীয়তঃ এই নাটকটির গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ৪ঠা মার্চ, ১৮৭৬ সালে পুনরাভিনয়েব সময় 'গজদানন্দ' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক মঞ্চস্থ করার অপরাধে ইংরেজ সরকারেব রাজপুরুষেরা মঞ্চে হানা দিয়ে উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু প্রমুখ শিল্পীদের গ্রেপ্তার কবেন। এই কারণেও নগেন্দ্র-নাথের এই নাটকটি বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাঁব রচিত অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'গুইকোয়াব' ১৮৭৫ সালের ২২শে মে, বেঙ্গল থিয়েটাবে মঞ্চস্থ হয়। তাঁর 'পারিজাত হরণ' (১৮৭৬) নাটকটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁব অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে 'সধবার একাদশী'তে অটল, 'নীলদর্পণে' নবীনমাধব, 'পুরু-বিক্রমে' সেকেন্দার, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'তে সুরেন্দ্র, 'কৃষ্ণ-কুমারী'তে বলেন্দ্র সিংহ, 'মৃণালিনী'তে হেমচন্দ্র এবং ১৮৭৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত উপেন্দ্রনাথ দাসের আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নাটকে যুবরাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দর্শকদের প্রশংসা লাভ কবেন।

নগেন্দ্রনাথ তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন, তেমনি তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্যও নানারূপ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার চেষ্টা করেছেন।

নগেন্দ্রনাথ বাগবাজারের এক বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর কলিকাতার এক সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পুত্রেরা সকলেই সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। নগেন্দ্রনাথের অগ্রজ দেবেন্দ্রনাথ ন্যাশনাল

থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ ভ্রাতা কিরণচন্দ্র সে যুগের এক খ্যাতকীর্তি অভিনেতা রূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকে তিনি বিন্দুমাধবের চরিত্রে রূপদান করে প্রশংসিত হন। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন গিরিশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র। নগেন্দ্রনাথদের ১৭নং রাজা গুরুদাস স্ট্রীটে বাড়ি ছিল। ঐ বাস্তুটি ক্রমে বেশ্যালয়েতে পরিণত হলে, ওরা বাগবাজারে ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বাড়ি করে চলে আসেন।

সে যুগের প্রথানুসারে নগেন্দ্রনাথের অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। তার প্রথমা কন্যা ধরাসুন্দরীর সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র রায়বাহাদুর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

মুকুন্দদেবের দুই কন্যা অনিন্দিতা দেবী ও অনুপমা দেবী বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নামকরা লেখিকা রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নগেন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্যা প্রবোসুন্দরীর পুত্র যশস্বী কথাসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নগেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১২৫৭ এবং মৃত্যু হয় ১২৯৯ সালে। মাত্র ৪২ বছরের এক সম্ভাবনাময় জীবনের অবসান ঘটে দুর্ঘটনায়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সেদিন নাট্যশালার হয়েছিল অপূরণীয় ক্ষতি। নগেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল, যার ফলশ্রুতি স্বরূপ বর্তমানে আমরা তার উপস্বত্ব ভোগ করছি।

গ্রন্থ-পঞ্জী

গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প—মহেন্দ্রনাথ দত্ত

গিরিশচন্দ্র—দেবেন্দ্রনাথ বসু

গিরিশ-প্রতিভা—ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভারতীয় নাট্য-মঞ্চ (১ম ও ২য় খণ্ড)—ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

Indian Stage—Dr. H. N. Das Gupta

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—শ্রীরমাপতি দত্ত

বাংলা নাটক ও নাট্যশালা—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দৃশ্যকাব্য পরিচয়—সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়

ভারত-কোষ (১ম ও ৫ম খণ্ড)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

শতবর্ষের নাট্যশালা—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত

অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য—ডঃ অরুণকুমার মিত্র

অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি—ডঃ অরুণকুমার মিত্র

একশো বছরের বাংলা থিয়েটার—শিশির বসু

অর্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার—শঙ্কর ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গালয়—অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অমৃত-মদিরা—অমৃতলাল বসু

আমার জীবন—বিনোদিনী দাসী

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

গিরিশ রচনাবলী—ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ)

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (২য়, ৪র্থ, ৭ম ও ৮ম খণ্ড)—
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌

Story of Calcutta Theatres—Prof. Sushilkumar Mukherjee

নাট্যশালার ইতিহাস—কিরণচন্দ্র দত্ত

অপূর্ব সতী (নাটক)—সুকুমারী দত্ত (গোলাপসুন্দরী)

আত্মকথা—শিবনাথ শাস্ত্রী

নিজেরে হারায়ে খুঁজি—অহীন্দ্র চৌধুরী

যাঁদের দেখেছি—হেমেন্দ্রকুমার রায়

পত্র-পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা ॥ ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ ॥ অনুসন্ধান ২৭শে জানুয়ারী, ১৮৯৪ ॥ পূর্ণিমা ১৩০৭, শ্রাবণ সংখ্যা ॥ অমৃতবাজার পত্রিকা (বাংলা ও ইংরাজী) ॥ সুলভ সমাচার ॥ মধ্যস্থ ॥ নাট্যমন্দির ॥ নাচঘর ॥ বেঙ্গলী ॥ সৌরভ ১৩০২, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা ॥ ইণ্ডিয়ান মিরর ॥ রেইজ এণ্ড রায়ত ॥ সাধারণী ॥ রূপ ও রঙ্গ ॥ মানসী ও মর্মবাণী ১৩২৭, কার্তিক সংখ্যা ॥ দি হিন্দু রিভিউ ॥ সাপ্তাহিক শিশির ॥ বাঙ্‌লা ॥

নির্ঘণ্ট

* ৮০ পৃষ্ঠায় মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’ পড়িতে হইবে।

খ্যাতিমান নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তের জন্ম ইং ১৯১০ সালের ৭ই ডিসেম্বর (বাং ১৩১৭, ২১শে অগ্রহায়ণ) নদীয়া জেলার রাণাঘাট শহরে। পিতা রাণাঘাটের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মাতা টীকাকার ভরত মল্লিকের বংশসম্ভূতা সুনীতি দেবী। পিতামহ 'নীতি-রত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীনাথ গুপ্ত উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার যুগের বিশিষ্ট লেখকরূপে পরিচিত ছিলেন। রাণাঘাট পি. সি. এইচ. ই. স্কুলে ও মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। কৈশোরকাল থেকেই তিনি সাহিত্যানুরাগী। ছাত্রাবস্থায় তাঁর বহু কবিতা ও ছোট ছোট নাটিকা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাণাঘাট থেকে কয়েক বছর 'নদীয়ার বাণী' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। পরে



সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় সহঃ সম্পাদক রূপে যোগদান করেন। এরপর অল্পকালের জন্য তিনি 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। সুদীর্ঘকাল তিনি 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সহঃ সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তদানীন্তনকালের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক ও সমালোচকদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়। ১৯৪৪ সালে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে

নাট্যকাররূপে যোগদান করেন। এই সময় তিনি একাধারে মঞ্চ-নাট্য ও চিত্র-নাট্য রচনায় এবং চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৫৩-৫৭ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ একুশ বছর স্টার থিয়েটারের নাট্যকার ও পরিচালকরূপে যুক্ত থাকাকালীন তিনি বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করেন। নাটক ও নাট্য-শালা সম্পর্কিত তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি বর্তমানে নাট্যামোদীদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর রচিত মৌলিক নাটকের সংখ্যা ১১, নাট্যরূপায়িত নাটকের সংখ্যা ২০, নাট্যশালা সম্পর্কিত লিখিত পুস্তকের সংখ্যা ৬, ছোটদের পুস্তকের সংখ্যা ৮, উপন্যাস ২ ও কাব্য-গ্রন্থ ১টি। ১৯৫৩-৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য, নাটক ও চারুকলা একাডেমীর পুরস্কার লাভ। ১৯৫৩-৫৭ সালে যথাক্রমে 'দাবী' ও 'বিদ্রোহী নায়ক' নাটক রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধাংশুবালা পুরস্কার লাভ। ১৯৫৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্টার থিয়েটার শত বার্ষিকী পদক প্রদান করেন। বর্তমানে তিনি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-বিভাগে এক্স্‌টেন্‌শান্‌ লেকচারারের পদে নিযুক্ত। নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে সুপরিচিত।